

आनन्दमयी



वर्ष ४७

एप्रिल १९९९

संख्या २

শুদ্ধ নাম, আমি জানি নামেই সব হয়। যত বেশী সময় পার তাঁর
জন্য দাও। নামে বেশী সময় দিতে না পারলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা
কর অথবা সংকীৰ্তন বা সদগ্রন্থাদি পাঠ কর। যে করেই হোক বেশী
সময় তাঁর দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা কর।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

প্রেমের প্রভাবে তুমি লভিলে বিজয় ॥

তাহা, যদি নাহি পার কর নাম জপ।

নাম জপ কলিযুগে হয় মহাতপ ॥

কোন দিকে চাহিবার প্রয়োজন নাই।

ওরে দাস সীতারাম নাম জপ ভাই ॥

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ

By Courtesy of :

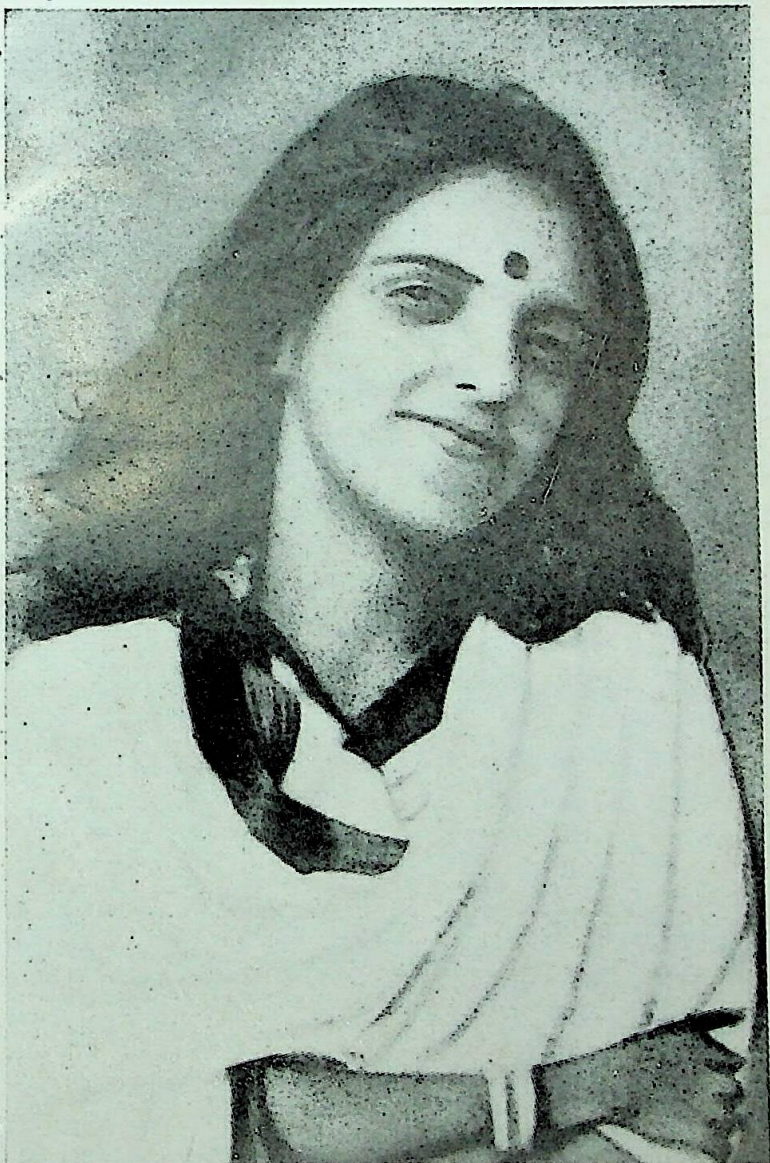
**M/S. BUILCON HUMAN HABITATION
CONSULTANTS PRIVATE LIMITED**

Architects, Engineers, Urban, Designers

266, Russa Road (South) Calcutta-700 033.

Phone : 473-6907, 473-5552, 473-4455

Fax : 473 6170



আনন্দ-বার্তা

“অমর আত্মা-অমর-পন্থী স্বয়ং আপনাতে আপনি”

৪৬ বর্ষ

এপ্রিল ১৯৯৯

২য় সংখ্যা

পরামর্শ-পরিষদ

ডঃ রমা রঞ্জন মুখার্জী

ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী

প্রঃ নারায়ণ গোস্বামী

ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত

ডঃ বীথিকা মুখার্জী

ডঃ কৃষ্ণা ব্যানার্জী

সম্পাদক : অধ্যাপক (ডঃ) গোপাল মিত্র

● বার্ষিক চাঁদার হার ●

ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল—৬০ টাকা (ডাক খরচ সহ)

অন্যান্য দেশে—

জাহাজ ডাকে—১৮ ডলার বা ১২ পাঃ

বিমান ডাকে—৩২ ডলার বা ১৮ পাঃ

প্রতি সংখ্যা—১৫ টাকা বা ৩ ডলার বা ২ পাঃ

আজীবন সদস্য চাঁদা :—

প্রতিটি ভাষার জন্য—ডাক মাশুল সহ

শুদ্ধমাত্র ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের জন্য ১০০০ টাকা

নিয়মাবলী

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও তাঁহার শ্রীমদ্ব্যখ্যাসূত্র অমূল্য উপদেশাবলী সম্বলিত রচনা 'আনন্দ-বার্তা'-র প্রকাশিত হইয়া থাকে। দার্শনিক মতবাদ, ধর্ম-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধক-মহাপুরুষগণের জীবনী, ধর্ম-সম্বন্ধীয় বাস্তব ঘটনাবলী ও আখ্যানিকাদিও 'আনন্দ-বার্তা'-র প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ নাতিদীর্ঘ (ফুলস্কেপ কাগজের ৪/৫ পৃষ্ঠা) এবং কাগজের একদিকে সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনমত প্রকাশযোগ্য পান্ডুলিপি পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন করা হইবে। সর্বদা প্রতিলিপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। অমনোমিত প্রতিলিপি ফেরৎ পাঠান সম্ভব নহে।

'আনন্দ-বার্তা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী এই তিন ভাষায় পৃথক পৃথক সংস্করণ বৎসরে ৪ বার (জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর) প্রকাশিত হয়। জানুয়ারী মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। 'আনন্দ-বার্তা'-র চাঁদা সব সময়েই অগ্রিম দেয়। বিদেশ হইতে প্রেরিত চাঁদা 'ইন্টার ন্যাশানাল মনি অর্ডার' অথবা 'ব্যাংক ড্রাফট-এ' পাঠাইতে হয়।

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা :

পারিকেশান ডিভিসান, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটী ৫৭/১, বালীগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯।

'আনন্দ-বার্তা' প্রকাশের একমাস মধ্যে পত্রিকা হস্তগত না হইলে গ্রাহকগণ অবশ্যই 'পারিকেশান ডিভিসানে' অভিযোগ পত্র পাঠাইবেন। পত্রে আপনার গ্রাহক নম্বর দিবেন।

গ্রাহকদের সুবিধার জন্য অনুরোধ ঠিকানা পরিবর্তন হইলে অবশ্যই তাড়াতাড়ি জানাইবেন অন্যথা পত্রিকা প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখা দিবে।

'আনন্দ-বার্তা'র গ্রাহকগণের প্রতি অনুরোধ :

(ক) বাকী চাঁদা সত্তর পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন।

(খ) পত্রিকা গ্রহণের অনিচ্ছা পূর্বেই পত্রদ্বারা আমাদের অফিসে জানাইয়া দিন।

ডি. পি. পি. তে কখনও কোন 'আনন্দ-বার্তা' পাঠান হয় না।

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটীর পক্ষে অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ কর্তৃক ৫৭/১, বালীগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীঅশোক কুমার রায়, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩১/১এ, নবীনচাঁদ বড়াল লেন, কলিকাতা ৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।

আনন্দ-বার্তা

৪৬ বর্ষ

এপ্রিল ১৯৯৯

২য় সংখ্যা

: সূচীপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। মাতৃবাণী	১—২
২। মাগো আমার আনন্দময়ী—মায়া মল্লিক	৩—৮
৩। মাতৃগুরুদ্বন্দ্ব মা আনন্দময়ী	
—অধ্যাপক কমলাকান্তঘোষ	৯—১৪
৪। তুমি ছাড়া গতি নাই—যদুপতি মল্লিক	১৪
৫। মাতৃতত্ত্বের ভাবব্যঞ্জনা—শ্রীশিশির মদুখোপাধ্যায়	১৫—১৮
৬। শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক লীলা দর্শন	
—মিহির রায়	১৯—৩৪
৭। অধমের জীবনে প্রথম মাতৃ দর্শন	৩৫—৪১
৮। মাতৃ সঙ্গীত—শ্রীমদনমোহন মদুখোপাধ্যায়	৪২
৯। পরম সত্যের পূর্ণ প্রকাশ	
—শ্রীঅমল কুমার রায়	৪৩—৪৬
১০। ঐ শূন্য মাতৃবাণী -ড. স্বামী তৃপ্তানন্দ (পদুরী)	৪৭—৫০
১১। নাম কীর্তন—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রক্ষিত	৫১—৫৫
১২। বিশিষ্টাষ্টৈতাবাদে গুরুপরম্পরা মাধুর্য	
—অভিজিত ভট্টাচার্য	৫৭—৬৬
১৩। প্রার্থনা—ব্রজগোপাল ঘোষাল	৬৭
১৪। শোক সংবাদ	৭০

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শুদ্ধ নাম, আমি জানি নামেই সব হয় । যত বেশী
সময় পার তাঁর জন্য দাও । নামে বেশী সময় দিতে না
পারলে তাঁর প্রসঙ্গ আলোচনা কর অথবা সংকীর্তন বা
সদগ্রন্থাদি পাঠ কর । যে করেই হোক বেশী সময় তাঁর
দিকে মনটা রাখতে চেষ্টা কর ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

শ্রীহারি লীলা গুণ যাহাতে বর্ণিত ।

তাহার তুলনা নাই জানিহ নিশ্চিত ॥

ধর্ম জ্ঞান আদি সহ কৃষ্ণ ভগবান ।

স্বধামে ভক্তের প্রাণ করিলে প্রয়াণ ॥

কলিযুগে নষ্টচক্ষু জনগণ তরে ।

আবির্ভূত ভাগবত সূর্য্য এ সংসারে ॥

রসের আলয় এই ভাগবত রস ।

রসিক সৃজন পানে হইবে সরস ॥

কাম ক্রোধ পাপ তাপ দূরে যাবে চলে ।

পাইবে পরম শান্তি ভক্ত অবহেলে ॥

সেই মত রামায়ণ গীতার পঠনে ।

পাপ মুক্ত হয়ে নর লভে ভক্তি ধনে ॥

ভক্তি গ্রন্থ পাঠে পাপ যায় চিরতরে ।

পাঠ বা শ্রবণ কর সদা প্রেম ভরে ॥

প্রেমময় লীলা গুণ শুনিতে শুনিতে ।

জপ দাস সীতারাম নাম এক চিতে ॥

সীতারামদাস ওংকারনাথ

By Courtesy of :

M/s. K. C. M. Foundation P. Ltd.

266, Russa Road (South)

Calcutta-700 033

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ
অবহিত। যখন যা প্রাণে আসে, তাকে জানাবে। আর সরল ও
ও ব্যাকুল হয়ে তার শরণাগতি প্রার্থনা করবে।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

আমি তোমায় উচ্চকণ্ঠে বলছি কেবল হরিনাম কীর্তন করলেই
পরমপদ্রুপার্থ প্রেম লাভ করবে, প্রেমময়ের সাক্ষাৎ দর্শন করবে।
অন্তে ওই পরম পদে প্রেমময়ের সহিত নিরন্তর থাকবে, থাকবে,
থাকবে।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ঙ্করনাথ

By Courtesy to :

M/S BUILCON CONSTRUCTION PVT. LTD.

266, RUSSA ROAD (SOUTH)

CALCUTTA-700 033

Phone : 473-6907

জীব স্বভাব এই রকমই। জেনে শুনে পাপ করা বড়ই
ক্ষতিকর।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

With Best Compliments from :

By Courtesy of :

M/s. Herbochem Remedies
India (P) Limited

Office :

45, Pratapaditya Place
Calcutta-700 026

Regd. Office Works :

54/1, Selimpur Road
Calcutta-700 031

Phone No. 466-6059

মাতৃবাণী

সংখ্যা জপেই শুদ্ধ জপ সমর্পণের বিধি। পথে ঘাটে যখন তখন হরিনাম খুব ভাল কথা। বাসি মূখে বাসি কাপড়ে ও যখন ইচ্ছা জপ করার বিধি তো আছেই। অন্তর্যামী ভগবান, অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই হইল।

*

*

*

একটী স্থান আছে, যেখান হইতে তোমার প্রাণে মন্ত্র স্ফুরণ হইতেছে; তত্ত্বসহ মূর্তির প্রকাশ হইয়া যাইতেছে, অন্তর গুরুদ্বার পরিচয় এইখানেই। যিনি, তোমার ভিতরে থাকিয়া সব কাজ করিতেছেন, প্রেরণা জাগাচ্ছেন—তিনিই অন্তর্যামী। তিনিই গুরু।

*

*

*

ভালো লাগুক, আর না লাগুক, অথ'ডভাবে সেই তাঁকেই নিয়ে থাকতে হবে। জপ, ধ্যান, পাঠ, কীর্তন যখন যেমন ইচ্ছা সবসময় মন তাতে লাগাবার চেষ্টা করা।

*

*

*

সব আশ্রমই তো এই শরীরের। তোরা মনে করিস, তোরা যে আশ্রমটি করেছিস সেটাই এর শুদ্ধ। জগত ভরাই তো এই শরীরের একটিমাত্র আশ্রম, দুটো কোথায়?

*

*

*

আশ্রমবাসী কেহ যদি কারুর সংগে মারামারি করে, তাহলে একদিন, একরাতি উপাস থাকিয়া ১০ হাজার জপ করিতেই হইবে। ইহা আশ্রমের নিয়ম। আশ্রমে থাকিতে হইলে বড়দের কথা মানিয়া চলিতেই হইবে। কাহারো নিকট হইতে কিছু নেওয়া—অর্থ বা বস্ত্রাদি একদম নিষেধ। অনুমতি বিনা আশ্রমের বাইরে অন্তর্যামী বাস করিতে পারিবে না।

*

*

*

সংসারের জন্য না কেঁদে, যে ভগবানের জন্য কাঁদে, সে তো সচ্চতুর। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য কাঁদতে হয়।

*

*

*

বিপথের অনুগামী হওয়া নয়। যিনি নিজের পথ জানেন না স্থিতিলাভ করেননি, অন্ধকারেই ডুবে আছেন, সে আশ্রয় কখনও গ্রহণ করিতে নাই।

*

*

*

মনুষ্য জীবনযাত্রা সফল করার জন্য উত্তম ক্রিয়ায় সদাই ব্রতী থাকা।

এখানের দরজা সর্বদাই খোলা—নিঃসংকোচে যখন ইচ্ছা তখনই আসিবে। যে যেখানে থাকুক না কেন, এ শরীরটা সব সময়ই তাহাদের কাছেই। নিজজন ভাবিয়া, যাহারা যতদিন এ শরীরটাকে আদরে সৎ ও সাধুসঙ্গ দ্যায়।

*

*

*

প্রজি মৃদুহৃতেই কাল গ্রাস করিতেছে—বাল্য গেল, যৌবন আসিল, একে অপরকে গ্রাস করিতেছে। প্রাকৃত দৃষ্টির সম্মুখে এটা ধরা পড়ে না। পরিবর্তনটা সামান্যই ধরতে পারে—সৃষ্টি, স্থিতি লয় এক জায়গায়। সবটাই অনন্ত। অনন্ত আর অন্ত একই। মালার মধ্যে সূতাটি এক, ফুলের মধ্যে ফাঁক। ফাঁক হইতেই অভাব দংশ। ফাঁক পূরণই অভাব মূক্ত।

মাগো আমার আনন্দময়ী

মায়া গল্পিক

মার কথা লিখে শেষ করা যায় না। অফুরন্ত ঘটনা মাকে নিয়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে।”

সত্যি মায়ের অলৌকিক, অসাধারণ ক্রিয়া-কলাপ ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না। মার সম্বন্ধে বহু বই পড়ে কথা শুনে ও নিজের অভিজ্ঞতায় মাকে ঈশ্বরের প্রেরিত মহামানবীর রূপ ধরে এই বিশ্বে শান্তি সেবা ও অলৌকিক কাহিনী সকলের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তিনি এ ধরাধাম হতে বিদায় নিলেও তিনি অক্ষয়, অমর।

মায়েরই উক্তি “আমার আসাও নাই, যাওয়াও নাই।” তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন, “সব কাজে ভগবানকে স্মরণ করবে। সং চিন্তা, সংকার্য, সংগ্রহ পাঠ করবে। গৃহে বাস করেও এবং গৃহকার্য করেও তাঁকে ডাকা যায়।” মার মধুর বদলি মন কে তৃপ্ত দেয়। আমার মনে হয় যারা মাকে সারাক্ষণ পাশে পেয়েছে, ছোটবেলা থেকে মার পাশে পাশে রয়েছেন, তাদের জীবন ধন্য। তারা ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। আমি মাকে পেলাম মাত্র কয়েকটি বৎসর। এই দুঃখ আমার বোঝাবার নয়। আবার ভাবি মার তো কত রকমের খেলা—ঠিক সময় মতই মা আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন এটাও কি কম সৌভাগ্য? চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিলেন—। আমি তখন মার দর্শন পাওয়ার জন্য অস্থির হয়েছিলাম—তাইতো ‘মা’ বদলে পেয়ে সন্তানকে ধরা দিয়েছিলেন। কত কৃপা যে মার পেয়েছি তা লিখে শেষ করা যাবে না। মার দয়ায় বহু শিষ্য শিষ্যাদের সাথে পরিচিত হয়েছি, তাদেরও স্নেহ

ভালবাসা, আশীর্বাদ পেয়ে জীবন আমার ধন্য হয়েছে। বেশীর ভাগ চিঠির মাধ্যমে একমাত্র শ্রদ্ধেয় ৩৬ঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রদ্ধেয় স্বামী স্বরূপানন্দ। ৩গঙ্গাদি এদের চরণধূলি পেয়ে ধন্য হয়েছি। ৩স্বামী পরমানন্দের অনেক চিঠি পেয়েছি মায়ের বয়ানে তাছাড়া নিজেও অনেক চিঠি দিতেন। আমার কাছে এসব চিঠি মহামূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। চিত্রাদির সাথে আমার সামনাসামনি পরিচয় না হলেও হলেও চিঠির মাধ্যমে আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। স্বামী স্বরূপানন্দ যখনই কলকাতায় আসেন আমাকে জানিয়ে দেন। আমরা বাড়ীর সবাই যতীনদাস রোডে রানুদির বাড়ী যেয়ে দেখা করি। সেই সময়টুকু কি সুন্দর যে কাটে, মনে হয় মায়ের স্পর্শ পর্যন্ত—। ঘর ভর্তি কত অজানা ভক্তরা থাকেন। কত আলোচনা, সুন্দর পরিবেশ—মনে হয়, আরও কিছুক্ষণ থাকি। কিন্তু উপায় নেই। মায়ের প্রসাদ নিয়ে বাড়ী ফিরে আসি। মায়ের অহেতুক কৃপা পেয়েছি অনেক। দীক্ষা নেওয়ার বাসনা নিয়ে মাকে যখন জানাই, মা আমায় দোলার সময় বৃন্দাবনে ডেকেছিলেন। কিন্তু আমার তা সম্ভব হয়নি। মা তা বদ্বতে পেরেছিলেন। আমাকে প্রসাদ পাঠালেন এবং তার তিন দিন পর মা আমায় স্বপ্নে দীক্ষা দিলেন। মার যে কত কৃপা, এ ব্যাখ্যা করা যায় না।

মাকে সর্বসময় অনুভব করি। যত ব্যথা, বেদনা, অসহায় অবস্থা জানাই। মা কিন্তু ঠিক বদ্বতে পারেন। তাইতো আমায় পাশে থেকে শক্তি দেন। কত বড় বড় বিপদ থেকে মা আমায় রক্ষা করেছেন। মা আমার বিপদতারিনী মা আমার অসহায়ের সহায়। মার অব্যর্থবানী পড়ি আর ভাবি সেই বাংলাদেশের খেওড়াগ্রামের নিষ্ঠাবান গরীব ব্রাহ্মণ কন্যা ‘আনন্দময়ী’ নামে বিশ্ব জয় করেছেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁর কর্মে ও শিক্ষায় মুগ্ধ ও মোহিত। কত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে, শত শত অসহায়ের উপকার করেছেন। দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক শিক্ষালয় মার সর্ব দিকে দৃষ্টি ছিল।

কারও বিপদ এলে তিনি বন্ধুতে পারতেন। তাঁর দয়াতেই বহু বিপদ থেকে বহুজন রক্ষা পেয়েছেন। লিখে বা বলে প্রকাশ করা যায় না মার কাহিনী।

জন্মগ্রহণ করেই মা হেসেছিলেন, সবাই হতবাক্ যত বড় হতে লাগলেন মার অলৌকিক ক্রিয়া আরম্ভ হলো। অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। বিবাহের পর স্বামী রমনীমোহন বন্ধুতে পেরেছিলেন মায়ের অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ তবু নানাজনের নানা কথায় মাকে অনেক ভাবে যাচাই করা হয়েছে। স্বামী রমনীমোহন মায়ের কাছেই দীক্ষা নিলেন এবং আর তখনই তিনি মায়ের কাছে “ভোলানাথ” নামে পরিচিতি পেলেন। শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষচন্দ্র রায় সংসার ও চাকুরী ছেড়ে মায়ের চরণে স্থান নিয়েছিলেন। আর তিনিই মাকে “আনন্দময়ী” নাম দিলেন। জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ই “ভাইজী” নামে পরিচিত। মারের স্নেহ ধন্য ‘ভাইজী’ দীক্ষা পেয়ে ধন্য হলেন। মায়ের সাথে তীর্থ করার পথে আলমোরায় তিনি দেহ রক্ষা করেন। ভাইজীর লেখা ‘মাতৃদর্শনে’ অনেক ঘটনা জানা যায়।

আমি মায়ের দর্শন পাই হরিদ্বারে। গঙ্গোত্রী থেকে ফেরার পথে “জয়পুত্রীয়া ধর্মশালায়”। সেই স্মৃতি স্বর্গসুখ। তখন শ্রদ্ধেয় ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রদ্ধেয়া ছবিদি আরও অনেকের দর্শন পেয়েছিলাম। ১৯৮৭ সালে কনখলে মায়ের সমাধিস্থলে ডাঃ সেনের পদধূলি নিয়ে ধন্য, কথাও হলো, কি ভাল যে লেগেছিল। ছবিদিকে একবারই সামনাসামনি দেখেছি। তবে কলকাতায় তাঁর যতীনদাস রোডের বাড়ীতে অনেক চিঠি দিয়ে যোগাযোগ রেখেছি। গঙ্গাদির সুন্দর ব্যবহার ভুলতে পারবো না। সন্তোষপুরে তাঁর বাড়ীতে দেখা করতে যাই। প্রথম দেখায় আমাকে জড়িয়ে ধরে কত আদর করলেন। স্বামী পরমানন্দের একটা ফটো আমায় দিলেন। অনেকক্ষণ ‘মার’ সম্বন্ধে গল্প হলো। আশ্চর্য করে বলোঁছিলাম

আমাদের বাড়ীতে একদিন আসতে । তিনি কথা দিয়েছিলেন । আমার স্বামী একদিন নিয়ে এলেন । ধন্য হলাম, তৃপ্তি পেলাম । স্বামী পরমানন্দ যখন অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য বম্বে গিয়েছিলেন তখন গঙ্গাদিও তাঁর সেবার জন্য বম্বে গিয়েছিলেন । আমাকে নিয়মিত চিঠি দিয়ে স্বামীজীর সব খবর জানাতেন । গঙ্গাদি যে এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন কল্পনাও করিনি । সবই মায়ের ইচ্ছা । গঙ্গাদি কি করে বদ্বতে পেরেছিলেন আমার মনের কথা । মায়ের সমাধীতে বহু ফুল ও মালা সবাই এসে দিচ্ছিলেন । গাঁদা গোলাপ মেশানো মালাটা আমার খুব নিতে ইচ্ছা করছিল । অবাক কান্ড । যখন আরতি ও স্তোত্রপাঠ শুনতে বেরিয়ে আসছি তখন গঙ্গাদি আমার ঐ চাওয়া মালাটাও এনে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন । আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গঙ্গাদিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “কি ক’রে তুমি জানলে আমার মনের ইচ্ছা” ? “সবই মায়ের কুপা”, গঙ্গাদি হেসে বললেন । আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম মায়ের কত চিহ্ন কতজন পেয়েছেন আমার ভাগ্যে আর হলো না । কিছুদিন পর গঙ্গাদি জানালেন, “তোমার জন্য চিত্রাদির হাতে মায়ের প্রসাদ ও মায়ের একটি তোয়ালে পাঠালাম” । এদিকে চিত্রাদিও চিঠি দিয়ে জানালেন কাউকে পাঠিয়ে জিনিষগুলো আনাও । আমার আনন্দে আবেগে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়লো । ছেলেকে পাঠিয়ে আনালাম । বদকে জড়িয়ে তোয়ালেটাকে কত আদর করলাম । মা যে কত অন্তর্যামী কত আপনার জন এসব ঘটনা কি লিখে বা বলে বোঝানো যায় ? তাই মায়ের উক্তির কথাই বার বার মনে হয় । “আমার আসাও নাই যাওয়াও নাই” । মার যে সত্য বাণীগুলি যখন পড়ি তখন মনটা কোথায় চলে যায় । মা বলতেন, “হরি কথাই কথা আর সব ব্যথা ব্যথা” । হাতে কাজ আজ মূখে নাম নিয়ে থাকলে কিছুই আর নিজের থাকেনা । সবই ভগবানের হয়ে যায় তাঁর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ; সর্বদুঃখ হতে রক্ষা পেতে হলে একমাত্র ভগবানের

আশ্রয় নিতে হয়।” “মাগো, তোমার সম্বন্ধে লিখে, বলে শেষ করা যায় না—তোমার কৰ্ম্ম তোমার খেলা বোঝা কঠিন।”

গঙ্গোত্রীতে যাবার সময় উত্তর কাশীতে মায়ের আশ্রমে প্রবেশ করেই আমার অন্তরে আলোড়ন ওঠে মায়ের স্পর্শ পাওয়ার জন্য। আশ্রমের পরিবেশে স্বর্গসুখ অনুভব করেছিলাম। কি মহিমা মায়ের। তাই মা' আমায় তাঁর বন্ধু স্থান দিয়েছিলেন।

মার ৩২টা আশ্রমের মধ্যে ৪টা আশ্রম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বৃন্দাবন আশ্রমে ও খুব ভালো লেগেছিল। মার থাকার ঘরটিতে ঢুকে ধূপ দিয়ে মাকে স্মরণ করেছিলাম, মার করুণা পেয়েছি। তারপর পূরীর আশ্রমটি ও দর্শন করেছি। মার আশ্রমগুলি সব তীর্থভূমি। ১৯৯২ সালে পূরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এর অনেকদিন আগেও গিয়েছিলাম কিন্তু তখন মাকে আমি পাইনি স্বর্গদ্বারে মার আশ্রমটিতে প্রবেশ করে মার পূজোর ঘরটিতে মার প্রতিকৃতির দিকে অপলক নয়নে চেয়ে কি আনন্দ ও তৃপ্তি পেলাম—শান্তিতে আমার মনটি ভরে গেলো। আরও পেলাম ঐ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত দ্ব'জন 'বয়স্কা ভদ্র মহিলাকে বৃন্দা দূর্গামাসী আর তার বোনের মেয়ে তারও বেশ বয়স হয়েছে। তাদের এত সুন্দর ব্যবহার ভোলার নয়। যে কদিন পূরীতে ছিলাম রোজই আশ্রমে যেতাম, আর দূর্গামাসীর কাছে মায়ের কত গল্প শুনতাম। দূর্গামাসী ৪০ বৎসর থেকে ঐ আশ্রমে ছিলেন। আমাকে বলেছিলেন “এখানেই যেন আমার শেষ জীবনটা কাটে”। কিন্তু জানিনা মায়ের কি ইচ্ছা মা-ই জানেন। দূর্গামাসীকে আমি বড় মা বলতাম। নিরামত আমি চিঠি দিতাম। এখান থেকে কেউ গেলে মায়ের জন্য ধূপ ও টাকা পাঠাতাম। হঠাৎ খবর পেলাম ‘বড়মা’ পড়ে যেয়ে শয্যাসায়ী আমি ব্যাকুল হয়ে খবর নিলাম। বড়মারা ঐ আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন তাদের বাড়ীতে। ঠিকানার অভাবে কোন খবর নিতে না পেরে অশান্তি ভোগ করতাম। তারপর জানতে পারলাম

‘বড়মা’ নেই মায়ের চরণে স্থান পেয়েছেন। মার ভক্তদের প্রতি একই কথা ছিল “নাম কর, শ্রদ্ধা নাম কর। নামেই সব হয়”। মায়ের কথা লিখে শেষ করা যাবেনা, যায়ও না। আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এবারের মতো শেষ করি। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে আমার লেখাটা মায়ের চরণে নিবেদন করছি।

মায়ের কাছে আমার আবেদন, নিবেদন, প্রার্থনা ও আশ্রয় মা যেন সর্বদা আমার কাছে কাছে থেকে আমাকে শক্তি ও সাহস সর্ব-কার্যে সাহায্য করেন। তাহলে আমার কোন ভয়, ভাবনা থাকবেনা। আমার পাশের বাড়ীর এক ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ আমায় ডেকে বলেন, “আপনিত আনন্দময়ীর শিষ্য “মাতৃকুপাহি কেবলম” বইটা পড়ছেন? আমাকে বইটা পড়তে দিলেন। বইটা পড়ে আমি অভিভূত হলাম, এবং বইটা কিনলাম। মায়ের বহু ঘটনা বইটা থেকে জানতে পারলাম। মায়ের অনূগত লেখকের কঠোর তপস্যা, মায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে ধন্য হলেন। মা কৃষ্ণানন্দ মহারাজকে ‘গোপাল’ দিয়েছিলেন আর শোভন বাগচীর নামাকরণ করলেন “কৃষ্ণানন্দ”। মায়ের একান্ত অনুরাগী ছিলেন এই “কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী”। মা, এই ‘গোপাল’কেই দুধ খাইয়ে ছিলেন। আমি মহারাজকে চিঠি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম। যেমন সুন্দর হস্তাক্ষর, তেমনি বয়ান। আমার যে কি ভালো লেগেছে খুব আনন্দ পেয়েছি। তিনি ভালো ভজন গাইতেন। আমার খুবই দৃঃভাগ্য সামনা সামনি দেখা হয়নি তবে চিঠিতে আশীর্বাদ পেয়েছি। তাঁর বিয়োগ ব্যথা বোঝানো কি যায়?

মায়ের অব্যর্থ বাণী—

“সকলেই ভগবানের সন্তান। ছোট বড়র প্রশ্ন নেই। যে কোলে যেতে চায়, তিনি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। যে সত্য অনু-সন্ধানের দিকে চলে সত্যই তাকে সব দিকে সহায়তা করে।”

জয় মা।

মাতৃগুরু মা আনন্দময়ী

অধ্যাপক কমলাকান্ত ঘোষ

[উদ্ধারচিহ্নে রাখা অংশগুলি মায়ের উক্তি]

যে চোখ দুটি দিয়ে আমরা জগৎ-সংসারের সব দেখি নিজের সেই চোখদুটি দেখতে পাইনে।

জগতের সব দেখি, যিনি জগৎ হয়েছেন তাঁকে দেখিনে। যা দেখতে পাই তা থাকে না। যা থাকে না তাই নিয়ে সংসারে থাকি, আর কাঁদি ? নিত্যসঙ্গী দৃষ্টি হয়ে যিনি নিজের কপালেই রয়েছেন তাকে দেখার কপাল আর হয় না। তা কেবল অদৃষ্ট হয়েই থাকে।

মা বললেন “নতুন করে পাবে আবার কি ? তোমার সব পাওয়া তোমাকেই তোমার পাওয়া, তোমার সব দেখা তোমাকেই তোমার দেখা। ‘সাধনা’ মানে নিজে নিজেকেই ‘সাধো-না’। আপনাকে পাবার দিকই একমাত্র দিক. আর সব বৃথা ব্যথা। তুমিই তো, একমাত্র।”

মায়ের কথাগুলি আলো-ছায়ার রহস্যে ঘেরা। কিন্তু প্রাণে দোলা দেয়। বোঝা যায়, বোঝা যায় ও না। আশ্বাস-ভরা মাতৃকণ্ঠ হতে নিঃসৃত হয়ে বিশ্বাসকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হৃদয়কে স্পর্শ করে। যেন আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দেয়—“তুমিই তো, একমাত্র।”

স্বামী দয়ানন্দজী একান্তভাবে ধরলেন, তুমি কে, বলতেই হবে।

মা বললেন, “যা তা। এ শরীরকে তোমরা যে যা ভাবো এ তাই। প্রকাশের পূর্বেও তাই, এখনও তাই, পরেও তাই। জগৎ জোড়া এ শরীরের একটাই আগ্রহ। তোমরা এ শরীর থেকে আলাদা কোথায় ?”

শুনে মহাত্মা থেকে সাধারণ ভক্ত অবধি সবারই মনে নীরবে উল্লাস জাগে। আঁধারে চাঁদের উদয় হলে যেমন সর্বক্ষে জোছনার

স্পর্শ লাগে। কিন্তু কোন আলোতে প্রাণে এই বোধের প্রদীপ জ্বলবে, কে পথ দেখাবে ?

মা বললেন “যিনি পথ দেখাবেন তিনি গুরু। সংসারে নানা যে তুমি দেখছ, এই নানাটা মিটবে কি করে ? এই নানার মধ্যে আপনাকে যদি পাও। সংসারে নানার মধ্যে আপনাকে যদি দেখ।”

মা, আমরা জীবনের সীমানা রক্ষার জন্যে সর্বদা পাহারা দিয়ে অল্প নিয়ে বাঁচি, সেখানে এমন বৃক জুড়ানো খোলা হাওয়ার কথা গল্প হয়ে যায়। সীমানা বাড়ীতে কড়ি লাগে। কে তা দেবে মা ?

মা বলেন, “এই সীমার পারে গুরুই পার করে দেন। গুরু-মর্তি ভগবানের ব্যক্তমর্তি। ব্যক্তেও তিনি, অব্যক্তেও তিনি, তাই গুরুরূপা প্রয়োজন। যিনি জানিয়ে দেন, তিনিই তো গুরু। একমাত্র তিনি তাঁকে জানান তো ? দীক্ষা অর্থাৎ গুরু বা ইন্টাই দীক্ষারূপে প্রকাশিত হন। বই পড়ে সব করা যায়, বীজও জানা যায়। কিন্তু তা যেন পুরুরের জল খাওয়া, গুরুমন্ত্র, যেন স্রোতের জল। স্রোতে পরম্পরা থাকে। যদিও দুটোই জল, বই পড়াতেও জানা যায় সত্য, কিন্তু পার্থক্য আছে। গুরুমন্ত্র ভিতরে স্পন্দিত হলে তাতে অঙ্কুর হয়, গাছ হয়। তারপরে ফুলে ফলে ভরে ওঠে।”

তবে তুমিই সেই গুরুমন্ত্র দাও, দীক্ষা দাও।

মা, বলেন, “পিতাজী, মাতাজী, এ শরীর থেকে তো এভাবে দীক্ষা হয় না। যেখানে এভাবে দেওয়া-নেওয়া সেখানে একজন দেয় একজন নেয়, দুইয়ের প্রয়োজন। এ শরীরের দুই নেই—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। আবার দেখ, কাউকে দেওয়া, কাউকে না দেওয়া এই ভেদ-বিভেদও এই শরীরে নেই।”

তবে সব জুড়ে যখন আছ সব তাপ মূছে নাও।

“এ শরীর কখনো তোমাদের ছেড়ে নেই, তোমরা যদি না দেখ

তো কি করা যায় ! মনে করবে যে সব সময়ে মায়ের সম্মুখে আছ, তোমার কাজ নিজেকে তাঁতে মিশিয়ে দেওয়া ।”

আমরা কিছন্ন করতে পারব না । তুমিই তো যা হয় করে দেবে । আমাদের উপর ভার দিও না । আমরা অক্ষম ।

“বাবা, তোমাদের করতে বলা হয় কেন জানো ? তোমরা যে মনে কর ‘আমরা করি’ ‘আমরা পারি’ এই জন্য ! যতক্ষণ লোকের মধ্যে চেষ্টা আছে ততক্ষণ চেষ্টা করা আবশ্যিক । যতক্ষণ চেষ্টার বন্ধ আছে ততক্ষণ চেষ্টা করতেই হবে । ভাগ্যকে ভোগ করতেই জন্মগ্রহণ । তুমি কতগুলি কর্মের জন্য জন্মগ্রহণ করেছ, তা না করলে তোমার কর্মক্ষয় হবে না । চেষ্টা করতে করতে কর্মক্ষয় হয়ে কর্মভোগ গিয়ে কর্মযোগ আসে । বিশুদ্ধ বুদ্ধি, বিশুদ্ধ ভাবের উদয় হয় ।”

তাহলে দিনগত কর্মক্ষয় করে যাই, আর আলাদা করে দীক্ষা, গুরুমন্ত্রের দরকার কি ?

“বিশুদ্ধ ভাব জাগাতে একটা পথ অবলম্বন করে থাকতে হয় । একটা উপলক্ষ ছাড়া চলতে পারে না তো । সংসারাগ্রম বা সন্ন্যাসাগ্রম সব আশ্রমেই গুরুকরণ প্রয়োজন । মানুষ্যের মধ্যে যে বিশ্বাসভাব আছে তাতেই গুরুতে বিশ্বাস এনে দেয় । বিশ্বাস কারও নেই একথা বলা যায় না । কোন না কোন দিক নিয়ে বিশ্বাস আছেই । এই বিশ্বাস গুরুতে ন্যস্ত করতে হয় । নির্ভরতাটা সব চেয়ে আনন্দদায়ক । সব তাঁর, সব তিনি ।”

সব তিনি, তবে আবার গুরুকরণ কেন ?

“মাস্টার, প্রফেসর না হলে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালভ হয় না, গুরু না হলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না । আধ্যাত্মিক উন্নতি, মুক্তি, যা কিছন্ন সবার ঐটুকুই যে সমস্যা । প্রফেসরকে ছাত্ররা কি চিনে নিতে পারে ? এজন্য কেউ কেউ বলেন, এক বৎসর সঙ্গ করে পরে গুরুত্ব বরণ করতে হয় । তাতেও কি চেনা যায় ?”

মা, তবেই দেখ আর এক সমস্যা। সমস্যার শেষ নেই, তার সমাধানও এক নতুন সমস্যা।

“তবে একটা কথা আছে, যার সঙ্গে যে সংযোগ তার নিকট থেকে সেটুকু পেলেই হবে। সেই অনুসারেই যোগাযোগ হয়। তুমি ঘোড়ার গাড়ী করে গিয়ে ট্রেন ধরলে, ট্রেনে উঠে ঘোড়ার গাড়ীকে তুচ্ছ করতে নাই, সে-ই পথ ধরিয়ে দিয়েছে। যে বাস্তবিক গুরুদ্বকে শ্রদ্ধা করে সে কাকেও লঘু করতে পারে না। যদি কাকেও লঘু করা হয়, তবে গুরুদ্বকেই লঘু করা হোল। কারণ গুরুদ্ব যে মহান, তিনি যে সকলের মধ্যেই আছেন। এ বিশ্বাস থাকা দরকার। তোমার পিপাসা পাঠশালা মেটাতে পারল না, কিন্তু পাঠশালার বিদ্যাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি গড়ে দিল। এ একই গুরুদ্বশক্তি। আশ্রয় দিয়ে অনুসন্ধান করিয়ে দেন। জগৎগুরুদ্বর স্বভাবই এই করুণা; ইষ্ট, গুরুদ্ব, মন্ত্র তিনই তো এক। এই এককে অনুভবে পেয়ে তাতে নিঃশেষে মিশে যাবার জন্যেই সব সাধন ভজন। খণ্ড-অখণ্ড ভাবে যুগপৎ থাকাকেই মিশে যাওয়া বলে। উহাই স্বরূপলাভ।”

শিক্ষাগুরুদ্ব, কুলগুরুদ্ব, সংগুরুদ্ব, কার থেকে বা বীজমন্ত্র নেওয়া যায়।

“বিচার করে একবার গুরুদ্বকরণ হয়ে গেলে পরে গুরুদ্বর পর অবিশ্বাস এলে অপরাধ হয়। মন্ত্র সম্বন্ধেও তাই। বাবা, ফসল পাবে এই বিশ্বাসের জোরেই তো বীজ নেও; ছোট দোকান, বড় দোকান দানা কিন্তু এক। চাষ তোমাকেই করতে হবে।”

“তুমি বলছ দেবীর উপরেই তোমার বিশেষ আকর্ষণ, অথচ তোমার কৃষ্ণমন্ত্র আছে, তবে কি করা? কথা হোল, তুমি নিজ গুরুদ্বমন্ত্র নিয়েই বসবে, তারপর যে মূর্তিই আসুক। মনে করবে, আমার ইষ্টই এই সব মূর্তিতে আসছেন। যেমন তুমি কখনো প্যাণ্ট পরে আসতে পার’ কখনো শাড়ী পরে আসতে পার। আবার

তোমার দুই-তিনটা নামও আছে, কিন্তু তুমি একজনই। তেমন দেখ এক তিনিই তো। মূর্তি ভালও আসতে পারে, খারাপও খারাপও আসতে পারে। কাত্যায়নি আসতে পারেন, কৃষ্ণও আসতে পারেন। কখনো কোন ঋষি আসতে পারেন, কখনো মদের বোতল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারে। তুমি তোমার ইষ্টমন্ত্র নিয়েই বসবে, মনে করবে ইষ্টেরই এই সব মূর্তি। তুমি নিজের মন্ত্রের উপরেই জোর দিয়ে বসে নাম করে বাবে।”

কত যে ব্যাঘাত, কত যে বিপদ আসে!

“কিসের বিপদ? সংসারে সর্বরূপে সর্বভাবে তিনিই, বিপদ রূপেও তিনি। তিনি সর্বস্ব বলে তাঁর খেলার এই ঢং, এই চলা। তাঁকে বাদ দিয়ে চলা হয় না, তাঁকে ভুলে থাকাও হয় মোহ। অজ্ঞানতাতেই এই কষ্ট, তিনি কোন কর্মভোগের মধ্য দিয়ে তোমাকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যাবেন তা তো তুমি জান না। তিনি ধুয়ে মূছে তাঁর কোলে নেন কিনা, তাই দুঃখ কষ্ট বিপদ। বিপদকে বিপদ বলে মনেই না করা। বিপদ মনে করাই পাপ। বিপদের সময় নির্ভরতা চাই, ধৈর্য ধরা চাই।”

একজন সম্ভ্রান্ত প্রোড়া মহিলা চোখের জল ফেলে কাঁদছিলেন।

শ্রীশ্রী মা বললেন, “কাঁদ কেন? তুমি সর্বত্র গুরুদেবকে দেখতে চেষ্টা কর। গুরু কি এতটুকু জিনিস? মনে কর এই আকাশ, বাতাস গুরু। এই যে কাপড় জামা পরেছি, এও আমার গুরু। এইভাবে গুরু আমাকে জড়িয়ে আছেন। আমার হাড় মাংস ইত্যাদি সব গুরু। গুরু ছাড়া কিছুর নাই। আমার প্রাণবায়ু রূপে গুরু আছেন। এইভাবে সর্বাবস্থায় তাঁকে সবার ভিতরে পেতে চেষ্টা কর।”

“যতক্ষণ তুমি-আমি আছে, নাম-রূপ আছে ততক্ষণ নামই সব। দেখ না একবার গিয়ে নদীতে পড়তে পারলে তারপর স্রোতই

সমুদ্রের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত নাম করতে হয়। আপনাকে আপনিই তো ডাকা। আপনিই আপনাকে পাওয়া।”

“হাত-সে করনা, মন-সে নাম চলানা, মুখ-সে নাম চলানা। তোমাদের কাছে ছোট মেয়েটার এই আবদার।”

জয় গুরু, জয় মা।

তুমি ছাড়া গতি নাই

যতুপতি মল্লিক

‘আশ্রয়’ করে তোমাকে মা-গো

সত্যের আলো পেয়েছি,

জগজ্জননী মা-গো আমার

তোমাকেই ভালবেসেছি !

তোমায় মনে করলে মা-গো

পদ্ম ফোটে বদকে,

পদ্ম-হাসিতে, সুগন্ধে মোর

হৃদয় ভরে সুখে।

অনেক খুঁজে তোমার পায়ে

এই প্রাণ-মন সঁপেছি,

তোমার কাছেই মা-গো পরম

বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছি !

‘অমৃত স্নেহ’ ‘অপার শান্তি’

তোমাকে ভেবে মা পাই,

সবই তুচ্ছ ‘তোমার পাশে’

তুমি ছাড়া গতি নাই।

মাতৃত্বের ভাবব্যঞ্জনা

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

জগৎসংসার বেন যোগবিয়োগের সঙ্গমস্থল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাক্রমে দুর্লভ মানবজীবন লাভ করে পৃথিবীতে এসে একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াকে আক্ষরিক অর্থে যেমন যোগ বলা হয়, তদ্রূপ জাগতিক কর্মশেষে ঈশ্বরের নিকট প্রত্যাবর্তনকে পরিভাষায় বিয়োগ বলা হয়। চরাচরে পার্থিবভাব সম্ভূত এই দ্বিবিধ যোগবিয়োগের ধারা ছাড়াও একটি অপার্থিব দিক আছে যেখানে উচ্চভাবযুক্ত যোগবিয়োগের ক্রিয়াশীলতা দৃশ্যমান হয়। সেই দিকটি হল যোগ জগৎ। পরমার্থ লাভে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া এবং লীলা সমাপনান্তে ভগবদ্রূপে লীন হওয়ার মধ্যেও যোগবিয়োগের ধারা সূচীত হয়। প্রথমোক্ত যোগবিয়োগের আনন্দ বেদনা একটা নির্দিষ্ট গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে সাধনমার্গের যোগবিয়োগের প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

শাস্ত্রীয় প্রবচন থেকে আমরা জেনেছি—

“সম্ভবামি যুগে যুগে” এই ধারাবলে সদা হয়

বহুদূপিনী ব্রহ্মময়ীর ধরায় অভ্যুদয়।

সাধক সাধিকার ছন্দবেশে জগজ্জননী লীলা করতে আসেন এবং জীবজগতের কল্যাণ সাধন করে আবার স্বস্থানে ফিরে যান। জগজ্জননীর বহুত্বের অভিলাষের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মা আনন্দময়ীর আবির্ভাবের মধ্যে। মায়ের যোগক্রিয়া মহামায়ার ইচ্ছার খণ্ড প্রকাশস্বরূপ বলে প্রমানিত হোল। সাধন জগৎ আনন্দময়ীর দৃষ্ট পদচারণায় আনন্দমুগ্ধ হয়ে উঠল। বহুদুখী

লীলামহিমায় ভাস্বর জীববৎসলা প্রেমবিহবল মাতৃপ্রাণির আভিজাত্যে ধরাধাম যখন গর্বির্ভূত হয়ে মায়ের গুণকীর্তনে উচ্চকিত— সেই আনন্দঘন মদহুর্ভে মায়ের মহাপ্রয়ানর্জিত অকাল বিয়োগে শোকাহত ধরণী সর্ব্ব কারণের কারয়িণী ও সসাগরা সাত্ব্যাজ্যের সম্রাজ্ঞী জগদীশ্বরী বিচারকে অসময়োচিত ভেবে মদ্যমান হোল। সেই তাত্ক্ষণিক প্রদাহে সান্তনার প্রলেপস্বরূপ জনমনে উদ্ভিত হোল এই ভাবনা—

ভবে মৃত্যুর দ্রুতটি পারে না কেড়ে নিতে মহাপ্রাণ

মহৎ জীবন মৃত্যুতে হয় তিলে তিলে মহীয়ান।

জনমনে মহাপ্রাণা মায়ের নির্ব্বাণের নৈর্ব্বিক্তিক বেদনার মধ্যে মদুর্ভূত হয়ে উঠল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার গৌরবগাথা। মাতৃহারা ভক্তজানর সম্বিত ফিরে এলো মায়ের অদৃশ্য নিগূঢ় লীলামহিমায়। সন্তানমণ্ডলী তাদের শোক অশোক সাগরে বিসর্জন দিয়ে লাভ করল এই শাস্বত চেতনা—

মহাপ্রয়ানেতে হয়না কখনো মহাজীবনের শেষ

সদৃশ্য থেকেই প্রেরণ করেন তারা পথ নির্দেশ।

এই সত্য সদুপ্রতিষ্ঠিত যে আনন্দস্বরূপিণী মা আনন্দময়ী ব্রহ্মদর্শিনী হয়েই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন জীবগজতের ব্রহ্মদর্শনের দুর্গম পথকে সুগম করে দিতে। বস্তুতঃ তাঁর সাধনা ছিল নিজের সিদ্ধির জন্য নয়, তিনি জন্মাসিদ্ধা হয়েই উদ্ভিত হয়েছিলেন মানবকুলের হিতসাধনের প্রয়োজনে। তাঁর সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হতেই তিনি অন্তর্হিত না হয়ে আড়ালে সরে গেলেন, কিন্তু দৃষ্টির অন্তরালে থাকলেও তিনি হৃদয়ের অন্তস্থলে থেকে ভক্তজনকে পরিচালনা করে চলেছেন। মন্দিরে, দেবালয়ে যেমন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, তেমনি ভক্তজনের হৃদয় মন্দিরে মা আনন্দময়ী বরাভয়রূপিণী হয়ে সততই রয়েছেন বিরাজমানা। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শের এখানে প্রবেশাধিকার নেই।

দৃশ্যতঃ মায়ের হাস্যবদনা মূরতি আমাদের নয়নগোচর না হলেও অন্তদৃষ্টিতে তাঁর করুণাবিগলিত মূরতির দর্শন হয়ে থাকে এবং হচ্ছেও । বেগবান অধ্যাত্মদরিয়ায় প্রবাহমান আনন্দময়ীর ভাবস্রোতে স্নানাত ভক্তজনের দর্শনোপলব্ধি ছাড়াও তারা যেন অহরহ শুনতে পাচ্ছেন দূর থেকে ভেসে আসা মায়ের কণ্ঠোচ্চারিত বরদানতুল্য আশ্বাসের সুর ঝংকার—

কে বলে আমার হয়েছে প্রয়াণ

ভাবসমাধিতে রয়েছি শয়ান

যোগাক্রিয়াবলে কৃপাবারি ঢেলে জুড়াই তাপিত প্রাণ । অবচেতন মনে প্রশ্ন জাগে সত্যি কি সূক্ষ্মলোকে অবস্থান কারিনী মায়ের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি নয়নগোচর হয় ? দেবলোক থেকে ভেসে আসা দৈবাদেশসম মায়ের নির্দেশ শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব ? —নাকি এসব কথার কথা, কল্পনার জাল বিস্তার মাত্র ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেশী দূরে অর্থাৎ শাস্ত্রীর ব্যাখ্যার গভীরে প্রবেশের প্রয়োজন নেই । হাতের কাছেই রয়েছে জীবন্ত দৃষ্টান্ত । মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহের মধ্যে ভবতারিনীকে দর্শন করেছিলেন এবং মহামায়ার মন গলিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছিলেন । তাহলে মায়ের প্রতিকৃতির মধ্যে ধ্যানকালে তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে না কেন ? মায়ের বার্তা কান পেতে শুনতে হলে, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হলে বিশ্বাস ভক্তিনিষ্ঠা ও সংঘসচেতনতার গ্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করতে হবে । তবেই শ্রীরামকৃষ্ণের মত আমাদেরও দর্শনোপলব্ধি ও শ্রবনোপলব্ধি লাভ হতে পারে ।

এখানে সংঘসচেতনতার কথা আসছে কেন ? এই প্রসঙ্গে শ্রীমতি ললিতাসখাজী কর্তৃক তাঁর আশ্রিত সেবক কিশোরী মহারাজকে লেখা একটি চিঠি স্মর্তব্য—“সেবক চাহিবে গুরুর স্নুথের পানে ও মদুথের পানে । গুরুর স্নুথময়, তিনি যাহা করিয়া স্নুথ পান, আমার তাহাতেই স্নুথী হইতে হইবে । সেবকের দেহমন

প্রাণ সম্পূর্ণ সেব্যের। যদি চৈতন্য আসিয়া থাকে, সর্বদা সেব্য নিম্নণ থাকে।” আনন্দময়ী মা সংঘ গঠন করে চেয়েছিলেন সন্তানরা সকলেই সংঘাশ্রয়ী হোক। “সংঘশক্তি কলৌষদুগে” এই আগুবাণীকে সম্বল করে একান্তে জপধ্যানে নিজেকে গদীটিয়ে না রেখে মায়ের আত্মস্বরূপ সংঘসেবার মধ্য দিয়ে গুরুসেবায় তথা মাতৃ-চিন্তায় আচ্ছন্ন হলে মায়ের দর্শন মিলবেই মিলবে। এই সত্যের সন্ধান লাভে ধন্য সত্যান্বেষণীগণের কণ্ঠে নিরবধি উদগীত হয়ে চলেছে মাতৃচরণে নিবেদিত শ্রদ্ধাজ্বলির মন্ত্র—

শুদ্ধীকরণ যজ্ঞ হইল তোমার পৌরহিত্যে
চিত্ত দানের লক্ষ্যে তুমি মা ভরনি আঁচল বিত্তে।

ভোগ বাসনায় হওনি লুপ্ত

তব মাহাত্ম্যে জগৎ মগ্ন

প্রণমি তোমারে আনন্দময়ী আছ সমাসীনা নিত্যে।

কারও দোষ দেখতে নেই। তাতে চক্ষু ও মন
মলিন হয়। —শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

Patra Builders

BUILDERS, CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIER

Calcutta Office :

82, B, Jatindra Mohan Avenue

Calcutta—5

Haldia Office :

Chaitanyapur (Haldia Road)

P.O. Chaitanyapur

Dist. Midnapore

Pin-721645

শ্রীশ্রী মায়ের অলৌকিক লীলা দর্শন

মিহির রায়

অসুস্থ কুট্টীবাবাকে কাশী আনন্দময়ী হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসছি ডাক্তারের নির্দেশ মতো। তিনি নিত্য আমাকে ওনার কাছে যাতায়াত ও সেবা করতে দেখে একদিন হাসপাতালের বাইরে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি ওনার কেউ হন? বললাম—না গুরুদ্বাই বলতে পারেন। জিজ্ঞাসা করলাম—ওনার অসুখটা কী? শনুছি ক্যানসার। তিনি কিছুটা গম্ভীর ভাবে বললেন—কে বলেছে? ওনার কোনও অসুখই নেই। ওনার শুদ্ধ সেবার প্রয়োজন। কুট্টীদাকে গাড়ী ঠিক করে সত্যেন (জামাই) ও আমি বিকালবেলা রওনা হলাম সারা রাত পথেই কাটলাম কুট্টীবাবার দুটি পা ও দুটি হাত একেবারে শক্ত হয়ে গেছে শুয়ে থেকে থেকে দুটি পা এতো ফুলেছে যে পায়ের চামড়া ফেটে যাবার উপক্রম। পা একেবারে মোড়ে না যার জন্য গাড়ীর দরজা বন্ধ করাও মর্দুক। সকাল বেলা তাঁকে নিয়ে রাজগীর আশ্রমে পৌঁছলাম। সেখানেও দেখলাম একই অবস্থা। সেবা তো আমিই করছি কিন্তু কোনও কিছুতেই কারো সাহায্য তো নেই রবং রীতিমতো উৎপাত যাতে সেখানে না থাকেন। অগত্যা সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে আমার বাড়ী আসারই ঠিক করলাম। সোঁদিনটা ছিল হোলির ঠিক ২দিন পর। কিছুতেই গাড়ী ঠিক হয়না। সোঁদিনও সত্যেন (জামাই) হঠাৎই হাজির তার সারা বছরের সব ছুটি শেষ তাই শেষবার গেছে যদি আমরা আশ্রম থেকে আসতে চাই সেজন্য। ওরা বার বার আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে কারণ আশ্রম ছেড়ে তিনি (কুট্টীবাবা) বেহুঁস অবস্থায়ও আসতে চাইতেন না। শেষে অত্যন্ত দুর্ভোগের

আনন্দ—২

জনাই হোক আর আমার শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ার জনাই হোক রাজী হলেন। কোথাও গাড়ী ঠিক করতে পারছেন না। কেউ আসতে চাইছেন না। শেষে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের চেষ্টায় গাড়ী ঠিক হলো। নানা বিভ্রাটের মধ্য দিয়ে পরদিন কুটুঁবাবাকে নিয়ে বার হলাম। পা দুটোর সাংঘাতিক অবস্থা। হাতও ওঠেনা। পুরো শরীরের ওজন চারগুণ বেড়ে গেছে। এই অবস্থায় তাকে গাড়ীতে তোলা হলো। পিছনের সীটে আমার কোলে উনি, পা দুটো ভাঙে না ফলে সোজা করে শোয়ানো। গাড়ীর দরজা অতি কষ্টে বন্ধ করা গেল। রাস্তা ঘাট কিছুই চিনি না গাড়ীর ড্রাইভার নানা রকম করে রাস্তায় দেরী করতে লাগলো। আমাদের বাড়ী ১টার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা। সেখানে ৪টার সময় হঠাৎ গাড়ী খুব জোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল যেখানে সেখানে তাকিয়ে দেখি শুধু কালো পীচের রাস্তাটা যতোদূর চোখ যায় পড়ে আছে ফাঁকা দুপাশে ছোট ছোট কিছু রক্ষণ পাহাড় চারিদিক শুধু নিস্তব্ধ ফাঁকা, কোথাও জন বসতি চোখে পড়েনা গাড়ীটা যেখানে ঝাঁকুনি খেয়ে দাঁড়ায় গেল সেইখানে ছোট্ট একটা গুমটীর মতো বাঁ পাশে আর ডান পাশে একটা দোতলা ব্যাস আর আর কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। ড্রাইভার নেমে গাড়ীটার একটু নীচু হয়ে দেখে নিয়ে বলল গাড়ী খারাপ গাড়ী আর যাবে না। আঁতকে উঠে বলি সে কী, এক তো এরকম একজন রুগী বার প্রতি ঘণ্টায় হটওয়াটার ব্যাগে গরম জল চাই তার উপর প্রসাব পায়খানা ঘন ঘন। তাই সঙ্গে কিছুই নেই আর কিছুক্ষণ পরে বাড়ী পৌঁছাবো ভেবে নিশ্চিত ছিলাম। ড্রাইভারকে বললাম—শীঘ্র মিস্ত্রী দ্যাখো। ড্রাইভার নির্বিকার ভাবে বলল—এখানে মিস্ত্রী কোথায় পাবো। জামাইকে যে মিস্ত্রী আনতে পাঠাবো তারও উপায় নেই কারণ আমি একা ওই ভারী শরীর উঠিয়ে জল খাওয়ানো প্রস্রাব করানো সম্ভব নয়। ২/৩ জন চাই তাও রাস্তার কোনওরকমে

দুজনে মিলে হয়ে যাচ্ছে কষ্ট করে, ড্রাইভার যখন কিছুতেই যেতে নারাজ কতকগুলো গাড়ী শব্দ করে করে তীর বেগে চলে যাচ্ছে তাও অনেকক্ষণ পর পর, একটী গাড়ী দাঁড়িয়ে দয়া করে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে সব জানতে পেরে আমাদের সঙ্গে নিতে চাইলেন কারণ শূণ্যলম্ব জায়গাটা অত্যন্ত খারাপ। দিনের বেলায়ও এখানে এভাবে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। যখন দেখলেন কুট্টীবাবার অবস্থা পুরো গাড়ীর একটা পার্ট ওনার জন্যই চাই। কারণ ওনার 'হাত পা কিছুই ভাঙ্গে না সব সোজা হয়ে আছে। তখন বললেন—গাড়ীতে তো হবে না কারণ গাড়ী ওদের ভারতি। কষ্ট করে সবাইকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতো তাদের এই আগ্রহ থেকে বৃন্দলম্ব জায়গা কতোখানি খারাপ। ওরা প্রায় জোর করে ড্রাইভারকে উঠিয়ে নিলো গাড়ীতে বলল—মিস্ত্রী নিয়ে আসতে। পাঁচ কিলোঃ দূরে শহর আছে টুন্ডীতে। এইসব শূনে এবং তার পরের পরিস্থিতি দেখে ভয় পেলাম। হঠাৎ দেখি সেখানে জন বসতি না থাকলেও গাড়ীর পাশে বেশ কিছু ছোট ছোট ১৭/১৮ বছরের ছেলের ভীড় আর দূরে দূরে বেশ বৃন্দা গুডামার্ক ২/১ জন বসে দাঁড়িয়ে গাড়ীর দিকেই দেখছে। এর মধ্যে ড্রাইভার যখন ফিরলো সূর্য ঢলতে শুরুর করেছে। দুটা বাচ্চা ছেলে নিয়ে এসে ড্রাইভার বলল—এরা মিস্ত্রী। তারা গাড়ীটাকে ঘুরে ফিরে দেখে বলল—এরা মিস্ত্রী। তারা গাড়ীটাকে ঘুরে ফিরে দেখে বলল—আজ হবে না। চোখ কপালে উঠিয়ে মহা বিরক্তির সঙ্গে ড্রাইভারকে বললাম তোমার একটুও কান্ড জ্ঞান নেই, এরকম একজন অসদৃশ্য লোক নিয়ে রাস্তায় পড়ে আছি, আর তুমি দুটী বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এলে তারা বলছে আজ হবে না। আমাদের ভাড়া গাড়ী করে দাও আমরা যাবো, এই বৃন্দ তাই অসদৃশ্য তাই সঙ্গে খাবার দাবার কিছু নেই, এই ঠান্ডায় আমরা কোথায় যাবো। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য কোরলাম—ড্রাইভার-এর ভাবটা যেন এখানেই আজকের রাতটা

ও আমাদের থাকতে হবে আগেই ঠিক করে রেখেছে। ওর নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়ানো দেখে জামাইকে ধমক দিয়ে বললাম—গুরুদ্বষ্টা কিছুর বদ্বয় ! জামাই বলল—আমি কি করব দেখছেন তো কথা শুনছেন, আর আমি গেলেও আপনার পক্ষে মঙ্গল। আমার তখন কেঁদে ফেলার অবস্থা। সূর্য্য পশ্চিমের দিকে অস্ত যায়, তখন বদ্বয়লাম আজ রাত কি ভাবে কাটবে। গাড়ীটাকে ঠেলে রাস্তা থেকে মাঠে নামিয়ে দিলো।

এই সময়ে দূর থেকে একটা ওই নিঃস্বপ্নময় এলাকায় একটা লম্বা চওড়া লোক চওড়া লোক ঠালাকে ঠেলতে ঠেলতে এদিকেই আসছে। তখন ঐ ভারী শরীর সারাদিন ধরে কোলের উপর পড়ে আছে। কোমর থেকে দুখানা পা অবশ। সত্যেনকে ডেকে বললাম—ওদের ডাকো সবাই মিলে বাবার শরীরটা ধরাধরি করে নামাও। এইখানে কম্বল পেতে একটু শ্রুইয়ে দিই। আমিও পারছি না উনিও পারছেন না ঐটুকু জায়গার মধ্যে। সত্যেন ঐ ঠালাওয়ালাকে ডাকতেই সে এলো। সত্যেন বলল—রাস্তার ধারে এটা কার ঘর, একটা কামরা যদি খুলে দিতেন। এনার এতো বয়স তাই অসুস্থ। এই ঠান্ডায় রাস্তার উপরে যদি শ্রুইয়ে রাখা যায় সারারাত তো ইনি নিশ্চয় মারা যাবেন। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরেই চোঁচিয়ে উঠলো ঘর আমার কিন্তু খোলা যাবেনা।

আমি দেখলাম এই অচেনা অজানা জায়গা তাই জায়গা ভালো নয় শুনলাম, সত্যেন আবার কি বলতে কি বলবে। তাড়াতাড়ি বললাম—না না আমরা এখানেই থাকবো। শ্রুদু দয়া করে এনার শরীরটা ভারী একটু নামিয়ে দিন। ধরাধরি করে রাস্তার উপরে একটা কম্বল পেতে বাবাকে শোওয়ানো হোলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে নামানোর পরে সত্যেন বলছে—মা এবারে বরং যাই গাড়ী দেখে আসি। হঠাৎ দেখি ঠালাওয়ালা বেশ জোরেই বলে উঠলো—না, না যাবেন না। আমি তাকাতেই বলে উঠছে এখানে নিত্য

ডাকাতি হয়। জানে মেরে ফেলে দেয়। এইতো পরশু দিনই একটা ট্রাক ড্রাইভারকে। তাছাড়া এখানে এই রাস্তার আর একটু পরে দেখবেন গাড়ীও চলবে না। আপনি যাবেন কিসে আর আসবেন কিসে? সত্যেন বলছে একটা সাইকেল দিন। আমি সাইকেলে যেতে পারব। বলছে সাইকেলও কেড়ে নেবে আপনার জীবনও যাবে। ওই ঠান্ডার মধ্যে রাস্তার উপরে খোলা আকাশের নীচে বসে আছি। ছোট ছোট কয়েকটা বাচ্চাকে ঠিক করলাম রাতে আমাদের কাছে থাকার জন্য। ইতিমধ্যে ঠালাওয়লাটা কুট্টীবাবাকে বলছে আমার ঘরে গাই আছে দুধ দুয়ে চা করে আনবো। উনি বেহুঁশ অবস্থাতেই করুণ সুরে বলে যাচ্ছেন গরম জল গরম জল। আমার সারা শরীরে বড় বন্দ্রণা। আমি অসহায় ভাবে মাঁকে ডাকাছি। ওই ঠালাওয়লাই জানিনা কোথা থেকে (কারণ যতোদূর দৃষ্টি যায় দেখে ছিলাম কোথাও জনবসতি নেই) হটওয়াটারে গরমজল ও চা করে নিয়ে এলো। বাবা বাবা করে খুব খাতির করছে। কুট্টীবাবা ওই অবস্থায় (তাঁর গলা দিয়ে তখন আওয়াজও বেরোতনা) বলছেন ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন তখন সে বললে—বাবা ভগবানের কৃপায় আমাদের অভাব কিছুই নেই। ইতি মধ্যে বেশ কয়েজন ষণ্ডাগুন্ডা লম্বা চওড়া চেহারার লোক ও কোথা থেকে যে আসছে সব এখনও তা বোধ গম্যের বাইরে। এসে আমাদের ঘরে বসে আছে কেউ কোনও কথা বলছেন। কথা বলছে শূদ্ধ ঠালা-ওয়লাটা। যখন গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এলো রাস্তায় সত্য সত্যই গাড়ীও বন্ধ হয়ে গেল যাতায়াত। তখন ঠালাওয়লাটা বলছে—ঘরটা খুলে দিই বাবাকে নিয়ে ঘরের ভিতরে শোওয়ান। সত্যেন বলছে হ্যাঁ, কারণ তখনই বাবার শরীর ঠান্ডায় শক্ত হয়ে গেছে। ঘর খুলে দিতেই, সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় ঘর ভিতর থেকে কেউ খুললো আমি তাড়াতাড়ি কম্বল একটা নিয়ে ভিতরে ঢুকে পাতবো বলে ঢুকতেই বাইরে থেকে হঠাৎ যে কুট্টীবাবার গলা থেকে

আওয়াজ বার হচ্ছিল না শুনছি তিনি চীৎকার করে বলছেন আমি সাধু ভিতরে যাবোনা। গলায় আওয়াজ শব্দে সামনে তাকাতেই যা দেখলাম তাতে ভয়ে শিউরে উঠলাম। ঘরের এককোনে প্রায় ৪০/৫০টা চকচকে বাঁশের তৈরী লাঠি ও বল্লম। প্রায় ৬ফুট করে লম্বা। আর ঠিক ডানদিকে একটা দেওয়ালে চৌকো করে কাটা ভিতরটা অন্ধকার একটা সড়স্বে মতো। আমি কম্বলটা হাতে নিয়ে ছুটেই প্রায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুব স্বাভাবিক ভাবে বলছি—ও'কে উনি যা বলেছেন তাই করতে হবে। সত্যেন বদ্বাছে না ও ভাবছে বাবা ঠান্ডায় এমনিতেই মারা যাবে। ঘরে ঢুকলে হয়তো বাঁচার আশা আছে। ঠ্যালাওয়ালাটা জোর করে ঘরে ঢোকাবে। সত্যেনও বোঝাচ্ছে, আমি দেখলাম—আমাকে যদি এরা বোঝে ভয় পেয়েছি তাহলে মন্স্কিল হবে। তাই খুব শান্ত ভাবে বললাম—হ্যাঁ উনি সাধু ওনাকে জোর করা ঠিক নয় সত্যেনকে আসতে করে বললাম—তুমি চুপ করো আমি দেখছি। লোকটা ঘরে ঢোকাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলল—আমরা যাচ্ছি তাহলে। বললাম—সে কী এরা যে এখানে থাকবে বলল। ছেলেগর্দুলির দিকে কটমট করে তাকিয়ে লোকটি ছেলে গর্দুলিকে ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেল। যে তারা আর ফিরে এলোনা। গর্দুলার মতো লোকগর্দুলি ও আসতে আসতে সব সরে পড়ল। সেই অন্ধকার রাতে সামনে শব্দ কালো সাপের মতো পীচের রাস্তা, আর দুধারে যতোদূর চোখ যায় ফাঁকা উপরে আকাশ। আমরা তিনজন রাস্তার উপরে, যা কাপড় চোপড় সঙ্গে ছিল সব কুট্রীবাবার গায়ের উপরে চাপা দিলাম। পিছনে আমি বসে, সত্যেন বসে। রাত বাড়তে লাগলো সারাদিন খাওয়া দাওয়া প্রায় কিছুই নেই। কিছুক্ষণ পর পর সত্যেনকে খালি জিজ্ঞাসা করছি কটা বাজে। ৮টা ৯টা ১০টা ১১টা। ঠিক যখন সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করছি কটা বাজে। বলল—১২টা। ঠিক তখনই নিশ্চয় ফাঁকা রাস্তার মধ্যে হঠাৎ মচ মচ আওয়াজে চমকে

উঠছি। তবে ততক্ষণে মা'র চিন্তায় অনেকটা সাহস ও শক্তি ভিতরে এসে গেছে কারণ ওই অসহায় অবস্থায়ই মা'র উপস্থিতি খুব ভালো করে অনুভব করছি। বদ্বাছি মা ছাড়া এ যাত্রা কেউ রক্ষা করতে পারবে না। বিশ্বাস হোলো মা'র প্রিয় সন্তান (কুটুম্বাবা) যখন রয়েছেন তখন বিপদ হতেই পারে না। কারণ বিকাল থেকে যে সব কাণ্ড তখনও পর্যন্ত ঘটেছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তখনই বোঝা গেছে কে আমাদের সঙ্গে কে আছেন।

কিছুক্ষণ পরে মচ মচ আওয়াজ কাছে এসে থেমে যেতেই চোখ তুলে তাকাতেই ক্ষণেকের জন্য চমকে উঠলাম—সামনে দাঁড়িয়ে যিনি তার চুল ও দাঁড়িতে পুরা মদুখ ঢাকা। শব্দ চোখ দুটী বার হয়ে আছে লাল টকটকে রক্ত মদুখে একটা কঠিন ছাপ। আর বগলের নীচে চেপে ধরে আছে একটা গুপ্তী।

প্রথম কথাই বলল—বাজখাঁই গলায়—এ লৌদ্ধ্রা কোন হ্যায়। সত্যেনকে দেখিয়ে। সত্যেন বিরক্ত হয়ে কিছু বলার আগেই সত্যেকে থামিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মদুহৃদ মধ্য মনে হোলো শ্রীশ্রীমা যেন সেই লোকটার (ডাকাত) প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন শান্ত ভাবে। কারণ যে সব প্রশ্নগুলি করছিল তার একটিরও উত্তর আমার পক্ষে ঐভাবে বদ্বন্ধর সঙ্গে দেওয়া সম্ভব ছিলো না। সে যাত্রা মা'ই যে স্বয়ং আমাদের উদ্ধারকর্তা হয়ে এসেছিলেন তা পরে পরিষ্কার বদ্বন্ধে ছিলাম। ঐ অন্ধকার রাতে ফাঁকা রাস্তার উপরে পড়ে থাকা। বদ্বন্ধ অসুস্থ মাতৃ সন্তানকে নিয়ে আমি ও সত্যেন যে ভাবে ছিলাম তাতে একটা অঘটন অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিছুক্ষণ পরেই লোকটা বাজ খাঁই গলায় পাণ্ডে এ পাণ্ডে বলে চীৎকার করতে রাস্তার ওপাশে যে গুমটীর মতো ছিল তবে ভিতর থেকে এক বয়স্ক লোক সাদা ধুতি ও গেঞ্জি পড়ে ধুতির আচলটা গায়ে জড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই বলে উঠছে হিন্দীতে—শ্রদ্ধাম এক সাধু বাবা নাকি এসেছে

অসুস্থ । আরে আমাদের এখানেও তো কিছুদিন আগে এক সাধুবাবা এসেছিল তাই না ? বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বেশ চড়া সুরে বলে উঠলো—কোথা থেকে আসা হচ্ছে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? বললাম । কথার মধ্যে মধ্যেই একবার করে হুঁকার ছেড়ে এ লৌন্ড্রা কৌন হয় । শান্তভাবে অনেক কথার উত্তর দেওয়ার পরে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—ঠিক আছে । তুমি কি জানো এটা ডাকাতের জায়গা । আমি বললাম—বাবা, জেনে কি করব । আমরা তো রাস্তায় পড়েই আছি অসহায় । তিনি বললেন—আমি তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি । কিন্তু আমার পরে যদি কেউ আসে তারা তোমায় না-ও ছাড়তে পারে বলে পাণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলল । কি পাণ্ডে ? অসুস্থ সাধু আর মাতাজী আছে তাই ছেড়ে দিলাম ! তার পরেই বললেন—গাড়ীতে যা মাল-পত্র আছে ও লৌন্ড্রাকে আমার সঙ্গে দাও সব নামিয়ে তোমাদের কাছে রাখো । আমার মনে হোলো সতোনকে যদি এখান থেকে ১পাও যেতে দিই তাহলে ওকে রক্ষা করা যাবে না । খুব ধীর ভাবে বললাম—বাবা গাড়ীতে যা আছে তা ওখানেই থাক । সাধুর আর কী মাল থাকবে ? তিনি জিদ করতে লাগলেন—নামাবার জন্য । আমিও একই কথা বার বার বলাতে তিনি বললেন—ঠিক আছে যদি ওসব চুরি হয়ে যায় ওখান থেকে আমায় দোষ দিওনা । বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে যেমন অন্ধকারের মধ্যে এসেছিলেন তেমনি অন্ধকারের মধ্যেই মিশে গেলেন । কি ঘটলো ব্যাপারটা বোঝার মতো শক্তিও আর ছিলোনা । এতক্ষণেই মধ্যে ড্রাইভার যে কোথায় চলে গিয়েছিল বিকাল থেকে তার দেখাই ছিলোনা । হঠাৎ রাত ১টার সময় হেডলাইট জ্বালিয়ে একটি গাড়ী এসে ক্যাঁচকরে আমাদের সামনে থামতে এতোবড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর একেবারে হাল ছেড়ে বসে ছিলাম । দেখি গাড়ী থেকে ড্রাইভার ও একটি লোক নেমে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাগাদা দিচ্ছে—চলুন চলুন গাড়ী এনেছি যেতে হবে । হঠাৎ

ঐ নিঃশব্দে শব্দে থাকা আমাদের ভাবনায় যাঁর শেষ অবস্থা জীবিত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আর পারবনা, সেই কুট্টীবাবা আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—আমি ভোর হওয়ার আগে যাবো না বলে, এবারও সত্যেন তাড়াতাড়ি উঠেছে যাবার জন্য । আমি হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে ওদের দৃঢ় স্বরে বললাম—ভোর হবার আগে আমি কিছুতেই যাবো না । ওরা আমাকে খুব চেঁচামেচি করে বোঝাতে চাইলো এখন না গেলে আমাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই । আমি বললাম—অর্ধেক টাকা নিয়ে রেখে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে গিয়ে ভেবেছিলে মজা দেখবে আবার ভয় দেখাচ্ছ । আমি কিছুতেই ভোর হবার আগে যাবোনা । আমার মনে হচ্ছিল এ পর্য্যন্ত যা যা ঘটিছিল তা থেকে রক্ষা পাচ্ছিলাম কুট্টীবাবার ভিতর থেকে মা-ই সর্বক্ষণ আমাদের সাবধান করেছেন এবং তিনিই এ যাত্রা বাঁচিয়েছেন, তাই তাঁর কথা অমান্য করা কোন মতেই চলবেনা, অগত্যা ওরা রেগে গাড়ীর দরজা দড়াম দড়াম করে ফেলে আমাকে রাগ দেখাতে লাগল নানা বাজে বক্তা করতে করতে গিয়ে গাড়ীতে শুলো আমরা রাস্তাতেই পড়ে থাকলাম ।

ভোর হতে যখন ধরাধরি করে কুট্টীবাবাকে ওঠাচ্ছি, শরীরে কোনও সাড়া নেই । বাড়ীতে যখন নিয়ে এলাম মেয়ে কাঁদতে লাগলো এই বলে যে বাবাকে সেবা দিয়ে ভালো করার জন্য আনতে গিয়ে আমাদের কপালে মেয়ে ফেলার বদনাম জুটবে ।

আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার আমি ভেবেছিলাম এতো সব কাণ্ড যে ঘটলো তা কুট্টীবাবা বোধহয় কিছুই জানেন না, কারণ যে ভাবে মৃতের মতো পড়েছিলেন, এক দিন পরে হঠাৎ হতেই প্রথম কথাই বলছেন—ডাকাতদের গল্পটা সবাইকে শুনিয়ে দাও । আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম উনি কি করে এসব জানলেন ? সত্যেন বলল—আমার মোটেই ভয় লাগেনি কারণ আমি জানতাম বাবা আমাদের সঙ্গে আছে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না । মা যে

কি অলৌকিক ভাবে আমাদের রক্ষা করলেন। তা একমাত্র আমিই বললাম। মা যে সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ঘটনা। পরে অনেকের কাছে শুনলাম ওই জায়গায় ডাকাতদের নাকি এমন রাজ ওখানে পুর্লিসেরও কিছু করার নেই সেখান থেকে বেঁচে ফিরে আসা সত্যি অলৌকিক ঘটনা। অনেকে এই ঘটনার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা সারদার ডাকাতদের খম্পর থেকে বাঁচার ঘটনার সঙ্গে মিল খুঁজে পান।

বাড়ী ফিরে এসেছি ঠিক একদিন পর রাত সাড়ে ৯ টার পর একটী ফোন আসে, আমার স্বামী মিহির রায় এর নামে। ধরতেই ওঁদিক থেকে যারা কথা বললেন—এবং পরিচয় দিলেন তাঁরা সবাই অপরিচিত। বললেন—কুটুঁবাবা বলে রাজগীর থেকে কেউ আপনার ওখানে আছেন, হ্যাঁ বলার পরে বললেন—আমরা যাবো সেখানে কি ভাবে যেতে হবে যদি একটু বলে দেন। সব শুনে বললেন—আমরা ২/৩ জন যাচ্ছি, উনি বললেন—স্টেশনে গাড়ী রাখবো আমি আপনাদের চিনে নেব। সেই দিনই আর এক কান্ড হট ওয়াটার ব্যাগটা হঠাৎ ফুটো হয়ে যায়। বাড়ীতে আমি আর আমার স্বামী, তৃতীয় কেউ নাই। এনার সমস্ত কাজ ও সব সময় ডাক্তার প্রয়োজন এনাকে ছেড়ে দুজনের একজনও ১ মিনিটের জন্যও কোথাও যাবার উপায় নাই, মিহিরকে বললাম—লাজকে (মেয়ে) ফোন করে বলে দাও কলকাতা থেকে কালকের মধোই যেন ১টা হট ওয়াটার ব্যাগ কিনে পাঠিয়ে দেয়। একদিন কোনও রকমে চালিয়ে নেব। সেদিন সকালের ট্রেনে অপরিচিত ৩/৪ জন মাড়োয়ারী ছেলে এলো বাবাকে দেখতে। তারা যখন নামলো আশ্চর্যের বিষয়—প্রচুর জিনিস। তেল, ডাল, নুন থেকে আরম্ভ করে, দামী দামী ফল, সরবত, মিষ্টি, কম্বল, চাদর, কাপড়, গামছা জিনিস বার করতে, বললে কারো বিশ্বাস হবেনা কিন্তু আশে পাশে যারা দেখেছে তারা পর্যন্ত বিস্ময়ে হতবাক ২টা ঘর প্রায়

ভরতি হয়ে গেল, এমন কি নানা রকমের ধর্ম পুস্তক থেকে আরম্ভ করে কি নয়। এতোসব জিনিসেও আমি অবাক হইনি, কারণ মার অলৌকিক নানা লীলা দর্শন করে আমি ততোদিনে চুপ হয়ে গেছি, এতো সবার মধ্যে যা আশ্চর্য আমার কাছে লাগলো তা হচ্ছে সব শেষে যখন ১টী হট ওয়াটার ব্যাগ বার করে তুলে ধরলো তখন আমি আর থাকতে না পেরে কথা বলে উঠলাম কি আশ্চর্য! ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাতেই—বললাম দেখুন ওনার হট ওয়াটার ব্যাগটা ফুটো হয়ে যাওয়ায় আজই মেয়েকে কোন করতে বলেছিলাম ব্যাগ কিনে পাঠাবার জন্য আর আপনারা নিয়ে এসেছেন একী অন্ডুত? তখন তিনি বললেন—এ সব ডালমিয়াজী নিজে বসে বসে সাজিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। বলে একটা একটা ওষুধ বিষুধ, হজমী, শক্তি হবে সেসব আয়ুর্বেদিক ওষুধ সব কখন কি ভাবে খাওয়াতে হবে তা পর্যন্ত নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। মৃগ্ধ হয়ে গেলাম এখনও এমন ভক্ত এই কলিযুগে আছে, যাকে দেখেনি, চেনেনি, জানেনা তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধা ভক্তি এষে কল্পনাতীত। তার সঙ্গে টাকা প্রণামী দিয়েছেন। আর বলেছেন—ওই সাধুবাবার ছবি তুলে নিয়ে আসবে। ওনার বাবার সঙ্গে আমারও ছবি তুললেন। কারণ বাবা প্রতি কথায় সবাইকে বলছেন—আমার মা আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে। খাওয়া দাওয়া করে বিকালে তাঁরা চলে গেলেন। বাবাকে দেখে তারা আনন্দিত মৃগ্ধ। চিন্তা করতে গেলে এ এক অলৌকিক ঘটনা। যে ডালমিয়াকে তিনি কখনও দেখেননি জানেন না চেনেন না, আবার ডালমিয়াজীও যাকে কখনও দেখেননি জানেন না চেনেন না তিনি কেন এতো সব করলেন, বৃন্দ্র বাইরের ব্যাপার, পিছনে শ্রীশ্রীমার অনন্ত কৃপা ছাড়া একে আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে জানি না। এরপরে বার বার ডালমিয়াজীর কাছ থেকে কাপড়, কম্বল, মশারী ফল, শুকনো ফল. মধু, আচার ঔষধ আসতেই লাগলো। তারপরে একবার তাঁর বাবাকে দেখার ইচ্ছা হোলো।

তিনিও বৃন্দ এবং অসুস্থ না হলে তিনিই আসতেন এই আনন্দ ধামে ।

বাবাও মায়ের আলৌলিক কৃপায় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ৯২ বছর বয়সেও আসতে আসতে সুস্থ হয়েছেন বটে তবে খেতে পারেন না কারণ হাত মুখ পর্যন্ত ওঠে না । পায়খানা স্নান সবই করিয়ে দিতে হয়, তবুও আগের থেকে অনেকই সুস্থ । আগে দিন এবং রাত্রি সর্বদাই জেগে তাঁকে পাহারা দিতে হতো কখন বা পড়ে যাবেন, কখন বা বিছানায় পায়খানা বা প্রসাব করে ফেলবেন । এসব অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছেন এখন বলতে পারেন । তবে হাঁটাচলা ওঠা-বসা পারেন না । এনারও এমন এক ভক্তকে দেখার বড়ই ইচ্ছা । শেষে দুজনার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে, সে ভদ্রলোক ডালমিয়াজীর কাছ থেকে এনার সঙ্গে আদান প্রদানের যোগসূত্র রাজকুমারজী তিনি সব ব্যবস্থা করলেন আমাদের ও আমাদের মন্দিরে নাম কীর্তন করে আসছে বরাবর সেই কীর্তন পার্টীকে নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করে একদিন ভোরে এসে কি সুন্দর ব্যবস্থা করে আমাদের নিয়ে গেলেন । এয়ারকন্ডিশনে ট্রেনে থেকেই ফোন করে করে সব ব্যবস্থা করলেন । বাবাকে চেয়ারে করে ওঠানো, নামানো, গাড়ী পর্যন্ত যত্ন সহকারে নিয়ে যাওয়া । সেখান থেকে গাড়ীতে ফোনে ডালমিয়াজীর সঙ্গে কথা হচ্ছে, তিনি অসহিষ্ণু হয়ে বলছেন এতো দেরী হচ্ছে কেন ? আমি বাইরে বসে আছি কতক্ষণ ধরে । গাড়ী গিয়ে ডালমিয়াজীর বাড়ীর গেটে ঢুকতেই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখার সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম, যা সম্পূর্ণ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় । যতোটুকু বাহিরে প্রকাশ করা যায় ভাষাতে তা এইরকম—বারান্দায় বয়স্ক সবার সঙ্গে ডালমিয়াজী বসেছিলেন গাড়ী গিয়ে গাড়ী বারান্দাতে দাঁড়াতেই বৃন্দ ডালমিয়াজী কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসছেন গাড়ীর কাছে । পিছদ পিছদ তাঁকে ধরবার জন্য লোক দৌড়ে আসছে তাঁর জ্ঞান নেই । একজন শূদ্ধ ব্রাহ্মণ শঙ্খ বাজাচ্ছে, গোলাপ ফুলের

পাপাড়ি ছড়ানো হচ্ছে তার সঙ্গে ধূম কীর্তন। ডালমিয়াজী এসে গাড়ীর মধ্যে/সোজা বাবার পায়ের উপর। দৃজনের চোখ ভর্তি জল। ভাবে বোধ করি সবার চোখেই জল আমার যে কখন দৃচোখ বেয়ে জল পড়ছে তার হৃশ হোলো যখন উনি বাবাকে টাকা দিচ্ছেন গলায় মালা পরাচ্ছেন। আমিও তাড়াতাড়ি আমার ব্যাগ থেকে টাকা ও মালা বাবার হাতে দিলাম তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য। তিনি কিছূতেই বাবার কাছ থেকে নড়েন না। শেষে অনেক কষ্টে সবাই মিলে ধরে ধরে চেয়ারে করে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হোলো সেখানে ডালমিয়াজী আমাকে আমার স্বামীকেও প্রণাম করতে আসেন তাড়াতাড়ি হাত ধরে বলি আমার বাবার বয়সী আপনি এ কি করছেন? তাঁর দৃষ্টি যে কোথায় কী জানি শরীরটাই আছে হৃশ জ্ঞান যেন অন্য কোথাও। বাবাকে চেয়ারে বসিয়ে মাটীতে বসে বাবার ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া পা টা নিয়ে হাত বোলাতে লাগলেন। বাবা যতো তাঁকে উঠিয়ে নিজের পাশে বসতে বলেন—তিনি কিছূতেই বসবেন না। আমি উঠে গিয়ে তাঁকে অনেক বৃঝিয়ে বাবার পাশে বসালাম। ধূম কীর্তন হচ্ছে, ভাবে সবাই বেবশ। কারোরই হৃশ নাই। তারই মধ্যে অতিথি সেবা চলল। ডালমিয়াজীর পরিবারের সবাই এসে প্রণাম করতে লাগলো। ওদের এসবের মধ্যে আমাকে নিয়ে উপরে আমাদের জন্য যে ঘর ঠিক করা ছিল সেখানে গেল। আমার নিজে হাতে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে খাওয়া তাই তাড়াতাড়ি স্নান সারতেই ৩/৪ জন লোক এসে হাজির কি লাগবে না লাগবে। দেখলাম আমাদের ঘরের পাশেই ডালমিয়াজীর ঘর, তার পরেই ঠাকুর মন্দির। যে ব্রাহ্মণ শংখ বাজাচ্ছিলেন বৃদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সর্বদা মন্দিরের মধ্যে বসে বিগ্রহের পরিচর্যা করছেন এটাই তাঁর ডিউটী। একটি অখণ্ড প্রদীপ জ্বলছে এককোণে। আর এককোণে একজন বসে রামায়ণ পাঠ করছে। আলাদা আর একজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের পাশে একই রান্নাঘর আছে সেখানে বিগ্রহের ভোগ

রান্না হয় । আমাকে বলল—এখানে আপনি আপনার রান্না করবেন । সব দেখে শূনে বললাম—আজ আমি ঠাকুরকে ফল ভোগ দেব ব্যস্ত হোয়ো না । ডালমিয়াজী ফোনে যে যেখানে আত্মীয় স্বজন মেয়ে জামাই সবাইকে ডেকে আনিয়েছেন একে একে সব আসছে দর্শন করতে । বাবা একেবারে ভাবে বিভোর । তাঁর অবস্থা বর্ণনা করা যাবে না । চোখে না দেখলে । সারাদিন হৈ হৈ এবং নাম গানে বাড়ী মদুখরিত । সন্ধ্যা হয়ে গেল ১ মিনিট ও ডালমিয়াজী বাবার কাছ ছাড়েনি, এই বৃন্দ অবস্থা । সন্ধ্যায় প্রচুর লোক ঘর ভরতি নাম গানে সবাই মশগদুল । সব থেকে দেখার মতো ছিল সম্ভবতঃ ডালমিয়াজীর নাতির দুটি যমজ ছেলে । ছেলে দুটির বয়স খুব জোর ৬/৭ বছর হবে করতাল নিয়ে এতো সুন্দর নামের সাথে সাথে বাজাচ্ছে । এখনও এমন ধর্মপ্রাণ বাড়ী এবং নামপাগল আছে তা আমার ধারণা ছিলো না । ছেলে, যুবক, বৃন্দ সবাই নামে মাতোয়ারা । অপূর্ব দৃশ্য অপূর্ব সে ভাব । সেইদিনই বিকালে আমাদের আগড়পাড়া আশ্রমে যাবার কথা ছিল কিন্তু ওনাদের একান্ত ইচ্ছাকে না করে যাওয়া হোলো না । সন্ধ্যায় ডালমিয়াজী ডাক্তার ডেকে বাবাকে দৌঁখিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন । সকাল হতেই ডালমিয়াজী ঘরে এসে বসে আমার সঙ্গে নানারকম কথা বলতে লাগলেন—তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন—বাবার যেভাবে সেবা করছি এখনকার দিনে এ বিরল । সেবাই পরম ধর্ম । এখনকার দিনে মেয়েদের সেবা ভাবনা থাকার কথাও বললেন ।

ডালমিয়াজীর বাড়ী থেকে আগড়পাড়া আশ্রমে গেলাম, সেখানে পরদিনই ডালমিয়াজী ও ওনার স্ত্রী প্রচুর জিনিষ নিয়ে আবার হাজির । সব থেকে সুন্দর তার শিশু সুলভ ভাবটি । এসেই বাবার পায়ের কাছে বসে পড়েন, কিছুতেই সঙ্গে বসবেন না ।

এখনও পর্যন্ত ডালমিয়াজী বাবার খবরা খবরই শুধু নয় তাঁর বিষয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাবটুকু অক্ষুণ্ণ আছে ।

(৩)

এর মধ্যে মা'র আর এক অলৌকিক লীলা হোলো দুই পাও দুই হাত বা তিনি নাড়তে পারতেন না । বিশেষ করে পা দুটী এতো ফোলা ও শক্ত ছিল যা মোড়া যেতেনা । হাঁটা চলা করতে পারতেন না চেয়ারে করে ৪ জন মিলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা করতে হতো । আসতে আসতে ২ বছর পর হঠাৎ করেই তিনি হাঁটতে শুরু করলেন । ৯৩ বছর বয়সে ঐ অবস্থায় ৩৬ বছর যিনি বিছানাকেই আশ্রয় করে ছিলেন যিনি পাশ ফিরতে পর্যন্ত পারতেন না । সারারাত দিন তাঁকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হতো । কোনওদিনই ভাবিনি তিনি আর কোনও দিন উঠবেন, হাঁটবেন । সেই তিনিই হাঁটছেন । মায়ের যে কী বিচিত্র লীলা । আর এই যুগে এভাবে প্রত্যক্ষ করা যাঁরা করেছেন তাঁদের ভাগ্যবান বলে স্বীকার করতেই হবে । ঠিক ২৬ বছর পরে আবার কলকাতা গেলাম বাবাকে নিয়ে । আগড়পাড়া আশ্রম হয়ে মেয়ের বাড়ীতে উঠলাম । খবর পেয়ে ডালমিয়াজী প্রচুর জিনিস পাঠিয়ে বাবাকে আনতে বিরাট এক গাড়ী পাঠালেন এই বলে বাড়ীর সবাইকে নিয়ে আসতে ।

শুনলাম আনরা যেদিন আগড়পাড়া আশ্রমে যাই তার আগের দিন ডালমিয়াজী মৃত্যুশয্যার ছিলেন । তাঁকে বিছানা থেকে নামনো হয়ে গিয়েছিল অলৌকিক ভাবেই তিনি বেঁচেছেন এবং সন্ধ্যা ৭টার সময় ঐ অবস্থায় শুনেছেন বাবা কলকাতা এসেছেন তখনি তিনি নিজে বলে বলে নানান সামগ্রী সব প্যাকিং করিয়েছেন এবং রাজকুমারজীকে দিয়ে বাবার কাছে পাঠিয়েছেন ।

হঠাৎ নিতে আসায় আমরা সেইদিন প্রস্তুত ছিলাম না ভেবে ছিলাম ২দিন পরে যাবে । কিন্তু তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়ায় আমরা গেলাম ।

এবারেও তাঁর ভাবের ব্যতিক্রম দেখলাম না । বাবাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছেন ২ চোখে জলের ধারা কোনও হুঁস নাই । তিনি

দেখেছেন বাবা হাটতে পারতেন না । এবারে ১টী হুইল চেয়ার নিয়ে এসেছেন (শুনলাম এটা এবারে বিদেশ থেকে আনিয়েছেন) তাতে বাবাকে ওঠাবেন । আমি কতো বলি তিনি হাটতে পারেন । তারা তা বোধ হয় বিশ্বাসই করতে পারছেন না । ডালমিয়াজীর বাড়ীর সবাই চেয়ারে বাবাকে বসিয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উঠিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন । এই কোটীপতির ঘরে এমন শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে আমার শূদ্ধ মূগ্ধই নই, মনে হয় সবাইকে ডেকে দেখাই ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে এ ভক্তি এই যুগে বিরল দৃষ্টান্ত । পরে ডালমিয়াজী যখন বললেন বাবা হাটতে পারেন ! তিনি বললেন—সব ভগবানের কৃপা । বাবা যখন বার বার সবাইকে বলছেন—আমর এই মা-ই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন । তখন ডালমিয়াজী আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন—এসব মায়েই কৃপা । মা আপনাকে কৃপা করেছেন তাই আপনি এইভাবে সেবা করতে পারছেন । আমাকে যদি কৃপা করতেন আমিও পারতাম । বললাম—ঠিক বলেছেন । আমরা কেউ কিছুর করার শক্তি রাখি না । পরম ব্রহ্মময়ী শক্তিই আমাদের কৃপা করে করছেন । বাবাকে হাটতে দেখে সবার চোখেই বিস্ময় ।

বিঃ দ্রঃ—সত্য ঘটনা যদি কারো বিন্দু মাত্র সংশয় থাকে তবে নীচের ঠিকানায় এসে দেখে যেতে পারেন । কুট্টীবাবা শ্রীশ্রীমা ও ভোলানাথের আশ্রয় হন ।

জয় মা

অধমের জীবনে প্রথম মাতৃদর্শন

প্রথমেই জানাই সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রী মায়ের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম । মাগো, তুমি নিজের কৃপা করে যদি তোমার এই অধম সন্তানের স্মৃতিপটে এসে দাঁড়াও, তবেই সম্ভব হবে আমার জীবনে তোমার পবিত্র স্মৃতিচারণ ।

মাগো আমার ভাষা নেই
জ্ঞান নেই ভক্তি নেই চিতে,
তবুও বসেছি আজ লেখনী নিয়ে
তোমার ওই রাঙাচরণ স্মরণ করে
তোমারই লীলাকথা তোমারই
শ্রীচরণে সঁপিতে ।

তারিখ ঠিক মনে নেই, তবে সেদিন ছিল দ্বিদিমার সম্ম্যাস উৎসব (শ্রীশ্রী মায়ের মা) । হরিদ্বার দর্শন করে তারপরে যাবো কাশ্মীরে বেড়াতে । আমাদের সঙ্গে ছিল আরও চারটি পরিবার । যথাসময়ে আমরা ভোলাগিরি ধর্মশালায় উঠলাম । বিকালে দর্শনীয় স্থানগুন্ডি দর্শন করবার জন্য টাঙা নিয়ে প্রথমেই গেলাম 'কন্থলে' । দক্ষরাজার মন্দির দেখে ফিরাছি । আমি এক ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে আর কি কি জিনিষ দেখার আছে ? উনি বললেন, সামনেই আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম আছে । ভদ্রলোকের কথামতো এগিয়ে গিয়ে দেখি মস্তবড় একটি হলঘরে কিছুর ভক্ত, কি যেন পাঠ হচ্ছে তাই মনোযোগ সহকারে শুনছেন । এর আগে আমার জীবনে কোন মহৎ দর্শন হয়নি । তাই খুব কৌতুহলী হয়ে

এক বাঙালী ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, “আচ্ছা, আনন্দময়ী মা কোথায় থাকেন এবং তাঁকে দর্শন করা যাবে?” তিনি উত্তর দিলেন, “আজ দিদিমার সন্ন্যাস উৎসবের ভাণ্ডারা ছিল, সেই উপলক্ষে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে পাঁচশত সাধুর সেবা করা হয়েছে। তাই মা খুব ক্লান্ত। অতএব মায়ের দর্শন হবে না। অবশ্য যদি কোন private কথা থাকে, তাহলে হয়তো দর্শন হতে পারে। তা-ও যদি ব্রহ্মচারীণী দিদিদের অনুমতি পাওয়া যায় তবেই।” আমি তখন বাধ্য হয়ে তাঁকেই বললাম দিদিদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করিয়ে দিতে। ভদ্রমহিলা পরিষ্কার বলে দিলেন যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন সময় সেখানে ‘তন্ময়ানন্দ মহারাজ’ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভদ্রমহিলা তখন আমাকে তন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে কথা বলতে বললেন। কিন্তু তিনিও সেই একই কথা বললেন, “মা ভীষণ ক্লান্ত, দর্শন হবে না।” হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল, “মা-কে আমার ভীষণ দরকার”। অথচ কী দরকার, আমি নিজেই তখন পর্যন্ত জানিনা। হঠাৎ আমার স্বামীর মুখ থেকে শোনা একটি স্বপ্নের কথা মনে গড়ে গেল— আমার স্বামীর যখন কুড়ি একুশ বৎসর বয়স, তখন তিনি একদিন স্বপ্ন দেখছেন, শ্রীশ্রী মা তাঁকে একটি মন্ত্র জপ করতে বলছেন এবং মন্ত্রটি যাতে ভুলে না যান তার জন্য বসে জপ করতে বলছেন কিন্তু তিনি ভাবলেন মন্ত্রটি খুবই পরিচিত অক্ষর, অতএব ভুলবার কোনই কারণ নেই। সেজন্য তিনি আর জপ করলেন না। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, সকালবেলা উঠে শত চেষ্টা করেও আর মন্ত্রটি মনে করতে পারলেন না। তারপরে মায়ের সঙ্গেও কোন যোগাযোগ করে উঠতে পারেন নি। আমার মনে হলো সেই স্বপ্নের কথাটিই মা-কে জিজ্ঞাসা করব। মনে হওয়া মাত্রই স্বামীজীকে তা বলে ফেললাম। তিনি সব শুনেন বললেন, “দেখি চেষ্টা করে। তবে, আজকে মায়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে বলে আশা দিতে পারছি না।” এই বলে তিনি

নীচতলায় মায়ের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছ্রক্ষণ পর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে বললেন, “বোনটি, আমি অনেকবার বললাম, কিন্তু দিদির অনুমতি পেলাম না। তবু, এই বারান্দায় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো। মায়ের কৃপা হলে হয়তো দর্শন হতেও পারে। তাছাড়া আরতির সময় দিদিমার সমাধি মন্দিরে মাকে নিয়ে যাবে। তখন কথা না হলেও, দর্শনত হবেই।” এই বলে তিনি চলে গেলেন। এদিকে আমাদের অন্যান্য সঙ্গীরা অপেক্ষা করতে রাজী নয়। তারা আমাদের উপর একটু বিরক্ত হয়েই ধর্মশালায় ফিরে গেলেন। এদিকে ছেলেকে নিয়ে আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি একজন ভদ্রলোক একটি মালা হাতে নিয়ে মায়ের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মা মা করছেন। এমন সময় এক ব্রহ্মচারীণী দিদি এসে বললেন, ‘আপনি এভাবে চিৎকার না করে মালা ওখানে রেখে দিন’। ওখানে মায়ের একটি চেয়ার ছিল। উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, “চেয়ারটি কি মা? ওখানে কেন মাকে মালা দিতে যাবো?” এই বলেই তিনি বেশ জোরে চন্ডীপাঠ করতে আরম্ভ করলেন। আমি অবাক হয়ে ভদ্রলোককে দেখছি। এমন সময় মায়ের ঘরের দরজা খুলে পারুলদি বেরিয়ে এসে বললেন, “দুর্গাপদ্র থেকে কে এসেছেন? মা তাকে ডাকছেন।” আমি ছেলেকে নিয়ে ঢুকতে যাবো, তখনই পারুলদি বলে উঠলেন, “বাচ্চাকে ভেতরে নেবেন না”। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠলাম, “বাচ্চা যেতে না পারলে, আমিও যাবো না।” তখন আমার স্নেহময়ী মা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “ওদের ভেতরে আসতে দাও”। ভিতরে ঢুকেই দেখি একটি সাদা ধবধবে বিছানার উপর মা বসে আছেন। মায়ের শ্রীচরণ থেকে গলা পর্যন্ত সাদা পোষাকে ঢাকা। একটা পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে বাম হস্তে বাম দিকের চোয়াল চেপে ধরে আছেন। আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম মায়ের বাম দিকের গালটা ফোলা। ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোক মায়ের

কাছে এসে বললেন, ‘মা, মাদুর কিনে এনেছি’। মা বললেন “কটা মাদুর এনেছ ? ক’টাকায় এনেছো ? ব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা আসন এনেছো কি না,” ইত্যাদি। মায়ের মদুখে এসব কথা শুনলে আমি মনে মনে ভাবছি, এ আবার কেমন মায়ের দর্শন করতে এসেছি ? এই মা তো দেখছি আমাদের সাধারণ মা-ঠাকুমাদের মতই হিসাব-নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রলোক বের হয়ে যেতেই মা আমাকে হিন্দিতে কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কোথা থেকে এসেছো ? কি বলবে ? মাকে আমি যত বলছি, মা আমি বাঙালি, মা ততই আমার সঙ্গে হিন্দি বলতে লাগলেন। এভাবে দু’বার বলার পর মা একটু হেসে বাংলায় বললেন, “কি বলবে বলো ?” আমি তখন মাকে স্বপ্নের কথাটা বলতে যাবো এমন সময় পিছন ফিরে দেখি, আমার স্বামীর দু’চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ছে। একটি কথাও তিনি তখন মাকে বলতে পারছেন না। আমি তখন মাকে স্বপ্নের কথাটা বলে বললাম, আমার স্বামীর ইচ্ছা, সেই ভুলে যাওয়া মন্দিরটি আপনি আবার ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিন। এই কথার উত্তরে মা আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি আগামীকাল সকালে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে এসো এবং এখন ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে দেখা করে সব জেনে যাও কি কি লাগবে।” আমি তখন মাকে বললাম, “মা শুনোছি স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে দীক্ষা নিলে ভাল হয়, তাই আমিও আগামীকাল ব্রহ্মকুণ্ড থেকে স্নান করে আসবো। মা আমাকে বললেন, “তুমি চার দিন পরে এসো। আমি একেবারেই নাছোড়বান্দা। মাকে আবার বললাম, “না মা আমরা কাল বাদ পরশু চলে যাবো। তাই আমিও আগামীকাল আসবো।” এমন সময় ব্রহ্মচারীণী দিদি আমাকে বললেন, “কেন আপনি মায়ের সঙ্গে তর্ক করছেন ? মায়ের কথামতো চারদিন পরেই আসবেন।” তার কোন কথা না বাড়িয়ে মাকে প্রণাম করে বাইরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম মা কেন আমাকে চারদিন পরে আসতে বললেন। আমার দেহের খবর আমি জানিনা,

অথচ, যাঁকে কয়েক মিনিট আগেও অতি সাধারণ মা-ঠাকুরমার মত মনে হয়েছিল, তিনিই বলে দিলেন বাধাটা কোথায় ? কয়েক মৃদুহৃৎের জন্য মনটা খারাপ হলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা আম্যর আনন্দে ভরে গেল আমার অন্তর্ধানিনী মায়ের লীলা দেখে । আরও অবাক হচ্ছিলাম, আমার মৃদু দিয়ে দীক্ষার কথা কিভাবে বের হলো ? এক মিনিট আগেও আমি যা ভাবিনি । কারণ, ছোটবেলা থেকেই আমি ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল । যাই হোক, আমাদের কাম্মীর যাওয়া বাতিল করে চারদিন পরে যথাসময়ে মায়ের আশ্রমে এলাম । ভাস্করানন্দজীর কাছ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে মায়ের ঘরে ঢুকতে যাবো এমন সময় ৬০/৬৫ বৎসরের এক বৃদ্ধা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা আজ তোমার দীক্ষা” ? আমি বললাম, হ্যাঁ । তখন তিনি বললেন, “মা তোমার ভাগ্য কত ভালো । তুমি এত অল্প বয়সে মায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নিতে সুযোগ পেয়েছ । আর আমার এমন দুর্ভাগ্য আমি যখনই ঠিক করি, তখনই কিছু না কিছু বাধা এসে পড়ে । যার জন্য আজও আমার দীক্ষা নেওয়া হলো না । অথচ আমার মেয়েদের দীক্ষা হয়ে গেছে ।” তারপর তিনি বললেন, মা আজকের দিনের মতো এমন দিন জীবনে আর পাবে না । তাই তোমাকে বলছি, তোমার কাছে যে আসনটি আছে ওটি মায়ের চরণে ছুঁইয়ে নিও । এই বলে তিনিও চলে গেলেন, আমারও মায়ের ঘরে যাবার ডাক এলো । যথাসময়ে মায়ের চরণে গিয়ে উপস্থিত হলাম । এবং দীক্ষাও হয়ে গেল । এমন সময়ে হঠাৎ আমার মনে হলো আমাদের পক্ষেও বার বার হরিদ্বার আসা সম্ভব নয় । কাজেই মাকেই বা আর কোথায় দেখতে পাবো । বরং এই ফাঁকে মাকে একটু আর্তি করে নেই । মনে হওয়া মাত্রই মাকে আর্তি করতে লাগলাম । মা বললেন, “এখানে নয় ওখানে ।” অর্থাৎ যেখানে আমার দীক্ষা হয়েছে । এরই মধ্যে আমার মনে পড়ে গেল একটু আগের সেই ভদ্রমহিলার কথাগুলি । অমনি আমার বসার

আসনটি মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, “মা আমার আসনটি আপনার চরণে ছুঁইয়ে দিন।” আমার কথা শেষ না হতেই পারুলদি বলে উঠলেন, আপনি কি পাগল না কি? যে আসনে আপনি বসেছেন, সেই আসনটি মাকে দিচ্ছেন চরণ ছোঁয়াতে? আমি সত্যিই হক্‌চকিয়ে গেলাম। এমন সময় পারুলদির কথা শেষ না হতেই মা আমার দিকে তাঁর শ্রীহস্ত বাড়িয়ে দিয়ে পারুলদিকে বললেন, “ও তো জানে না।” এই বলে মা আমার হাত থেকে আসনটি নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে ছুঁইয়ে দিলেন এবং আমার দিকে খুব হাসি হাসি মুখে বললেন, “এই আসনটি আর ব্যবহার কোর না, খুব যত্ন করে রেখে দেবে।” আমিও আসনটি মাথায় ঠেকিয়ে মায়ের কাছ থেকে ফল প্রসাদ নিয়ে, মাকে প্রণাম করে, ঘর থেকে খুব খুশি মনে বেরিয়ে এলাম।

তারপর যথাসময়ে বাড়ি ফিরে আসার পালা। গেলাম স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে মাকে প্রণাম করতে। মা-কে প্রণাম করতেই মা বলে উঠলেন, “তোমরা দুজনে দুটি মালা নিয়ে নেবে।” এবং আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি মাংস, ডিম পেঁয়াজ রসুন খাবে না।” শোনামাত্র আমি খুব দর্শিতাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। কারণ। একে আমি ডিম অত্যন্ত ভালোবাসি, তার উপর সংসারও আমার নেহাৎ ছোট নয়। অতএব আমার পক্ষে আলাদা রান্না করাও সম্ভব নয়। এইসব নানা অসুবিধার কথা ভেবে আমি মাকে বললাম, “মা আমার লোপ্রেসার এ্যাপিমেয়া, অম্বল-এর রোগে ভুগছি, কাজেই এসব না খেলে খুব অসুবিধা হবে।” মা বললেন, বাংলাদেশে টাটকা মাছ পাওয়া যায়। মাছ খাবে, ছানা খাবে, ছানার ডালনা খাবে। আমি এমনই মায়ের অধম সন্তান, এত কথার পরও মায়ের কাছে এইসব খাবার জন্য অনুমতি চাইছি। মনুহৃদয়ের মধ্যে মায়ের গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল, মা বলে উঠলেন, “এই শরীরের এখন অন্য

কোন কথা আসছে না, তোমরা পরে চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ কোরো। অগত্যা আমরা মাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম।

আমার মঙ্গলময়ী মায়ের আদেশ মাথায় নিয়ে সংসার করছি। প্রায় ছয়/সাত বৎসর পর আমার দুই পায়ের হাঁটুর নীচ থেকে একটা যন্ত্রণা শূন্য হয়। কেমন যেন দিনকে দিন পায়ের জোর কমে যাচ্ছে। ডাক্তার বললেন, “আপনাকে মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। আমি বললাম, ছয়/সাত বছর আগে থেকেই আমি এসব খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। বাই হোক্ মায়ের কৃপাতে আমার পায়ের ব্যাথা সেরে গেছে। মা আমার এত কৃপাময়ী, সাতবৎসর পরে আমার কি হবে তারজন্য দয়াময়ী মা আমার সাত বৎসর আগেই সাবধান করে দিয়েছেন।

আজও আমার স্নেহময়ী মায়ের সেই মধুর কণ্ঠস্বর হৃদয় মাঝে শুনতে পাই। মাকে যখন প্রণাম করে বেরিয়ে আসি মা ডেকে বললেন, “তোমাকে কেউ তোমার গুরু কে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কি বলবে? তুমি বলবে জগৎগুরুই তোমার গুরু।

তাহলে আপনারাই নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিপীনবিহারী চক্রবর্তীর কন্যা নির্মলা কে? কে এই নির্মলা? যিনি মানবী দেহ ধারণ করে আমাদের গর্ভধারিনী মায়ের মত লীলা করেছেন? সার্থক আমাদের মানবজীবন। ধন্য এই কলিযুগ। এমন মাকে আমরা ক্ষণিক-এর জন্য হলেও কাছে পেয়েছি। মায়ের প্রথম দর্শনের কথা এখানেই শ্রীশ্রী মায়ের চরণে অর্পণ করলাম।

মাতৃ সঙ্গীত

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

তুমি মহীয়সী, তুমি গরীয়সী

গাহি তব জয়গান,

নাম রসায়নে ভরপুর মোর

অন্তর মন প্রাণ ॥

নিত্য শূদ্ধ কোমল হৃদয়

তোমারে যে ডাকে নাহি তার ভয়,

তোমার চরণে পরাণ সঁপিয়া

নিজেরে করেছি দান ॥

প্রসূতি হলে না জীবনে কখনো

লক্ষ ছেলের মাতা,

প্রতি ঘরে ঘরে মঠে মন্দিরে

তোমার আসন পাতা ।

অঞ্জলি ভরি দুই করপুটে

তোমার চরণে পড়ে সবে লুটে,

আমি যেন পরি তাদের মতন

তোমারে করিতে ধ্যান ॥

পরম সত্যের পূর্ণ প্রকাশ

শ্রীঅমল কুমার রায়

মহামণীষী অনিবার্ণ কথা প্রসঙ্গে বলেছেন “দেখ, সত্যকে কেউ কেউ দেখতে চেষ্টা করেছেন। যারা দেখতে চেষ্টা করেছেন বা দেখেছেন বলে দাবী করেন। বস্তুতঃ তারা সকলে অংশ অংশ দেখেছেন, পূর্ণটা দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি বিশ্বাস করি ভগবন্তায়...” অনিবার্ণ শূদ্ধ মণীষী-নন, অনদ্বভী অধ্যাত্ম-পুরুষ ।

অনিবার্ণের উপরোক্ত উক্তিটি আমাদের (বিশেষ করে আমাদের) বিশেষ ভাবিয়ে তোলে । আমরা সাধারণ অবোধ মানুষেরা অধ্যাত্ম-ভাবে উদ্দীপ্ত হতে কোনও না কোনও মাধ্যম অবলম্বন করি এবং সে পথে চলতে গিয়ে মনুষ্যগুরু শরণাপন্ন হই । চলা যদি অব্যাহত থাকে তবে ধীরে ধীরে গুরু মध्ये পেতে চেষ্টা করি ইস্টের প্রতিমূর্তি । এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয় যে গুরুকেই মনে হয় জীবনের সর্বস্ব । গুরু বিভিন্ন থাকের একথা মহাজনদের কাছে জেনেছি কিন্তু গুরুসত্তা এক এবং সর্বোচ্চ থাকের । ‘সঃ প্রবেষমাণি গুরু’ পংক্তগদ্যলির এই ঘোষণা অনুধাবনীয় ।

বলা যেতে পারে সেই থাকটির উদ্দেশ্যে ভগবান শঙ্কর উচ্চারণ করেছিলেন “গুরুব্রহ্ম, ...” এই হল আমাদের পূর্ণ সত্যের মোটামুটি ধারণা । কিন্তু মনুষ্য শরীরে এই পূর্ণসত্যের প্রকাশ নিয়েই কথা তুলেছেন অনিবার্ণজী । মনে রাখতে হবে আমাদের এই আলোচনায় দেখা, জানা এবং হওয়া একটি শক্তি প্রবাহের পরিণাম ধারা । কথাটায় খুব ধ্যান দিয়ে ভাবা দরকার । কারণ, শ্রীমৎ অনিবার্ণ এমন কথা বলতেই পারেন না যাতে ভ্রম প্রমাদ এর অবকাশ থাকে বিশেষ করে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ।

একটি প্রশ্ন এসে যায় যে এই ভারতে যত মহাত্মা বিচরণ করেছেন তাদের মধ্যে সব মহাত্মা সম্বন্ধে তিনি অবদিত ছিলেন কি না। উত্তরটি কিন্তু নিঃসন্দেহে ভাবা যেতে পারে যে এ সম্ভব নয়। তা হলে তাঁর না জানা মহাত্মা সম্বন্ধে তাঁর এই উক্তি কি ক'রে প্রযোজ্য হয়। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। উত্তরটি কিন্তু তাঁর উক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবেই লুকিয়ে আছে। যেটি খুঁজে বের করাই এই আলোচনার একটি দায়। মনুষ্য শরীরের মায়িক উপাদানে পূর্ণ সত্যের প্রকাশ হতেই পারে না—এই তত্ত্বটিই অনিবার্ণজীর উক্তির মর্মকথা। সেই মর্মকথা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই বা সন্দেহের অবকাশ নেই। এটুকু বদ্ব্যবহারে পারলেই মনে নিতেই হবে যে তাঁর উক্তিটি সর্বতো ভাবে গ্রাহ্য।

তথাপি এই আলোচনার একটা তির্ষ্যাগা গতি অপ্রতিরোধ্য ভাবেই এসে পড়ে। আমরা ইদানীং দুটি সত্তাকে দেখলাম প্রায়ই একই কালে আমাদের মাঝে লীলা করে গেলেন। 'লীলা' কথাটি না লিখে উপায় নেই। মহাশক্তির সবিশেষ স্পন্দন 'লীলা' ছাড়া আর কোনও শব্দ দিয়ে বললে ঠিক বলা হয় না যেন। এই দুই সত্তাকে জেনেছি শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওংকার নাথ এবং শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা বলে। তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যেন এক এরই দুই বিভাগ অথবা একটিতে দ্বিধলের চিত্র। আমাদের কাছে উভয় এর এমন সব তথ্য আছে যে সাদা চোখে দেখলে মনে হবে কায়া—ছায়া। যে কোনও দিক তুলে ধরুন—ঠিক পাশটা অনুরূপ অপরের মাঝে। যিনি শূদ্ধ মার কথা জানেন ঠাকুরটির কথা জানেন না বা উল্টোটি তার পক্ষে আমাদের এ বক্তব্যটি বদ্ব্যবহারে কষ্ট হবে। আকস্মিক বা কাকতালীয় বলে মনে হবে তবু উল্লেখ রিখি যে জন্মভূমির নামটিতেও কি ছন্দোমিল কেও—থেওড়া।

বাবা সীতারাম মা আনন্দময়ীকে যে ঐতিহাসিক, না ঔপনিষদিক

চিঠিটি লিখেছিলেন তা আবার আংশিক তুলে ধরিছি—“দয়াময়ী মা গো, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র তুইই ছিলি...তুইই সব হ'লি...”

এই চিঠিটির বিশ্লেষণেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। সৃষ্টির পূর্বের খবর যিনি দিচ্ছেন তার স্থিতি যদি সেখানে না থাকে তবে সে খবর দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু আমাদের বদ্ব্যবহার স্বেচ্ছায়ের জন্যই এমন ভাবে লিখছি নইলে—সৃষ্টির পূর্বে দেশ-কাল-শব্দ এ সব কোথায়?

সেই স্থিতিতে থেকেও তিনি যেন উপচে পড়েছেন এই স্থিতিতে এই দেশ, এক কাল. এই শব্দ এবং সেই মন্ত্রেরই উচ্চারণ করে চলেছেন—“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ ” ‘অদঃ’ এবং ‘ইদম্’ এর গ্রাম যেন উদারা থেকে তারায় বাজছে। সেই সূত্রে শব্দেতে পাচ্ছি আর এক সত্তার ইঙ্গিত—‘তুইই ছিলি...’ সে স্থিতি আমাদের আপাতঃ-দৃষ্টিতে দেখা মনুষ্য শরীরে লীলাময়ী আনন্দময়ী। আমরা সেখানে যে শরীরটিকে ‘ন ভূতো ন ভবিষ্যতি’ লীলা করতে দেখলাম সে শরীরের পাঁচটি ভূত কি ভূতগুণে স্বাধীন ছিল? একই প্রশ্ন সীতারাম এর শরীর সম্বন্ধেও। এই মূল প্রশ্নের সমাধান যদি কেউ করতে পারেন তবেই এই কঠিন প্রশ্নের সমাধান আপনা থেকেই হয়ে যায় যে এই মায়িক শরীরে সমস্ত লীলাময় জীবনে অমায়িক শক্তির স্পন্দন এমনভাবে স্পন্দিত হয়েছিল যা শব্দ পূর্ণসত্যের প্রকাশেই সম্ভব। সমাধান নিশ্চয়ই আছে আর আছে বলেই আমাদের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছি যে এই দুই সত্তা যেন সেই পরমশিবের তত্ত্ব অবতরণ পরম্পরা—প্রথমে শিবরূপে তারপর তার তিন বৎসর পর শক্তিরূপে “এখানেও মহাকালের ছন্দ পূর্ণ মহিমায় ঘোষণা করছেন যে বৎসরের সংখ্যা তিনটি অক্ষরের ক্ষরণরূপে অ-উ-ম—এই তিন’

In the transcendental plane the Eternal Verbum and Kala Sakti should be viewed as an uncompromising unity”

'The Philosophy of word and meaning' by Gourinath Sastri ।

এই লীলাময় জীবন দুটিকে একই পদার্থ অহং সত্তার দুই বিভাগ বলে নিশ্চয়ই আমরা ধরে নিতে পারি যা কিনা পদার্থসত্যের প্রকাশ দেখা, জানা এবং হওয়ার পরিণামরূপে ।

শ্রীমৎ অনিবার্ণের উক্তিটিতে এই আলোচনার ভাবনা অনুপস্থিত হলেও উক্তিটি কিন্তু নিজ পরিপ্রেক্ষিতে সর্বতোভাবে সত্য ।

ভয় ভাবনা কেন ? তিনি আমার কাছে নাই—এই ভাবটার
জন্যই ত । তিনি ধরে আছেন, ভয় কি ? অভয়কে
ধরে থাকলে ভয়ের প্রশ্ন কোথায় ?

—মা আনন্দময়ী ।

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

BY COURTESY OF :

G. MANI

D/NO-6-4-17

SURYA RAOPET KAKINADA ROAD

ANDHRA PRADESH

ঐ শূনি মাতৃবাণী

ড. স্বামী ভৃগুনন্দ (পুরী)

এখনো শোনা যাচ্ছে—“আমি আছি, আমি এখানেই আছি।”
শ্রীক্ষেত্র পুরী ধামের স্বর্গদ্বার! কালীবাড়ী অতিক্রম করলেই
মহাশ্মশান, চির শান্তির আশ্রয় স্থান। সামনেই নীলাম্বরীরাশি!
অন্তহীন অনন্ত আহবান। তার পাশেই চির শান্ত মৌন নীরব
স্নিগ্ধ পরিবেশে অবস্থান করছে শ্রীশ্রী আনন্দগরী মায়ের প্রাচীন
আশ্রম। মাত্র কয়েক বছর আগেই মায়ের আগমনে করুণা ধারায়
ভাসিয়ে দিয়েছিল ভক্তদের মন প্রাণ। সেই জোয়ারের ধ্বনি আজও
শোনা যায়। আমি আছি, আমি এখানেই আছি। তোরা কোথায়
খুঁজে মরিস?

শোনা যাচ্ছে সেই প্রাচীন বেদ মন্ত্রঃ—

“ইয়ং তে যজ্ঞিয়া তনুরপো মৃগ্গামি ন প্রজাম্।

অহো মৃচঃ স্বাহাকৃতাঃ পৃথিবী মাভিশত্ পৃথিব্যা সম্ভব ॥”

(শব্দক্ৰমঃ যজুর্বেদ সংহিতা বা-মা-৪/১৩)

শ্রীমার মূখ দিয়ে সেই বেদের ঋষির উদ্গাত ধ্বনি এখনো
শোনা যাচ্ছে—

হে সন্তান, তে = তোমার, ইয়ং = এই (তনুঃ) = তনু, কারা,
যজ্ঞিয়া = যজ্ঞ করার জন্য, (সেই জন্য তোমার কর্তব্য কর্মের জন্য
আমি—অপঃ = কর্মকে, যজ্ঞকর্মকে মৃগ্গামি = খোলা রেখেছি।
চিহ্নিত করে রেখেছি। নপ্রজাৎ = প্রজাকে নয়, সন্তীতিকে নয়,
অর্থাৎ সন্ততি প্রজনন, সন্ততি পালন পোষণ আদি গৃহস্থোচিত
কর্মকে চিহ্নিত করছি না। সাধারণ সন্তানদের চাইতে পৃথক এমন
দেশহিতে ব্রতী, অহোমৃচঃ = পাপমুক্ত হতে চান এমন স্বাহাকৃতাঃ

=স্ + আ + হা + কৃতাঃ = চতুর্দিকে চষে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়, সর্বত্র যজ্ঞকর্ম সমাধান করে, তুমিও তাদের সাথে একত্রিত হয়ে এই রকম যজ্ঞ কর্ম করতে করতে পৃথিব্যাং—পৃথিবীর সাথে,—সম্ভব = সন্মিলিত হও, তল্লীন হও, তন্ময় এবং তদাকার হও ।

উল্লিখিত বেদমন্ত্রে আঙ্গিরস গোত্রের ঋষি নিজের কিছু শিষ্যকে দেশ মেধাপ্রাজ মহৎ কার্যে পরিপ্রাজক রূপে সংকল্প গ্রহণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন । আজও কান পাতলে সেই দ্বিতল খণ্ডে মায়ের আসন থেকে ঋষির উদগাত সেই মন্ত্রই শুনতে পাই ।

অর্থটি আর একটু ভাল করে বোঝার চেষ্টা করা যাক । “যজ্ঞ” শব্দ দেবপূজা, সঙ্গতি করণ, সংগঠন, এবং দান অর্থ বোধক “যজ্” ধাতু থেকে নিস্পন্ন হয়েছে । সূত্ররাং ‘যজ্ঞ’ অর্থে ঈশ্বরোপাসনা, সমাজ সংগঠন, দান, লোকসেবা, প্রভৃতি সংকর্মের-সমাবেশ হয় । একমাত্র নিষ্পাপ হতে পারলেই এইরূপ সংকল্প মানুষ্যের হৃদয়ে জাগতে পারে “অপঃ” শব্দের অর্থ নিষ্পত্তিতে দৃ-প্রকারের পাওয়া যায় । ১ । জল, ২ । কর্ম । এখানে ‘কর্ম’ অর্থই গ্রহণযোগ্য । কর্ম মানে যজ্ঞ কর্ম । উপাসনা, সমাজ সংগঠন, সমাজ কল্যাণ দান ইত্যাদি সংকর্মকেই বোঝায় । “মৃগ্গামি” = শব্দের অর্থ হল—মোচন করা । খুঁলে দেওয়া, মুক্ত করা—এইরূপ অর্থ বোধক—“মৃচ্” ধাতু থেকে নিস্পন্ন হয়েছে ।

নিরুক্তকারে “অহ” শব্দের অর্থ “পাপ” করেছেন । এখানে সেই-অর্থই করা হয়েছে । “আ” উপসর্গের অর্থ “আসমন্তাৎ” অর্থাৎ সকল দিক থেকে, চতুর্দিক থেকে—এই প্রচলিত ‘অর্থই’ এখানেও করা হয়েছে ।

অর্থাৎ আগ্রমের মায়ের আসনে প্রণাম করতে গেলে লেখক আজও যেন মাতৃকন্ঠ থেকে সেই বেদের উক্তিটিই পুণঃ পুণঃ শুনতে পান ।

সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্যই নিজের মায়ার দ্বারা লীলাচ্ছলে মা-ষে অবতীর্ণা হয়েছিলেন আমাদের মাঝে নিজেকে ধরা দিবার জন্য । ভাগ্যবান যারা তাঁরাই যথার্থ মাকে চিনেছেন । জেনেছেন । তাই না—আশ্রম সংবাদে নানারূপ কর্ম-যজ্ঞের সন্ধান পাই । মা'র শ্রুত পদাংগে সেদিনও দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি, জ্ঞান যজ্ঞ, নাম যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, অন্ন যজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, আদি যজ্ঞই না কর্ম যজ্ঞ । এই তো অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার পথ । যজ্ঞ না করলে তো হৃদয়ের কালিমা যায় না । তাই তো তিনি কনখল, দিল্লী, বৃন্দাবন, কাশী, দেৱাদুন, পুরী, রাঁচী, আগরপাড়া, খেওড়া প্রভৃতি স্থানে স্থানে দিকে দিকে জগৎ প্রাবিত করে শ্রুত সঙ্গ স্পর্শে সদুযোগ্য সন্তানদের জন্য কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে বীজ রোপণ করে তোলেন । এই বৃক্ষের ফল, ফুল, পত্রের দ্বারা মাতৃ পূজাই হবে আমাদের যথার্থ মাতৃপূজা ।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র একদিন অসুর দমনও ধর্মস্থাপনের জন্য রামেশ্বরে সেতু বেঁধেছিলেন । কাঠবিড়ালী বালীতে গড়াগড়ি দিয়ে গা ঝাড়িছিল সেই বাঁধের জায়গায় । যার যা শক্তি, যার যা সামর্থ্য তাই দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই মাতৃপূজা হয় দেব পূজা হয় ।

এই জন্যই বেদ মন্ত্রটি আবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—স্রী আছে, কন্যা আছে, পুত্র আছে, আছে পাত্রমিত্র বন্ধু বান্ধবও তাতে দোষ কি ? তাদের জন্যও কিছুর কর আবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জন্যও কিছুর কর । তাহলেই জীবন জনম সার্থক । নচেৎ বৃথাই মনুষ্য জন্ম । “বারে বারে আর আসা হবে না ।” এই বিখ্যাত বাউল গানটিও আমাদের এই বেদের কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয় ।

মাগো, তুমি কৃপা না করলে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তি হবে না । তুমি কৃপা না করলে আমাদের জ্ঞান আঁখি খুলবে না । তোমার অহৈতুক কৃপাই আমাদের পরম পাথর । তাই রামপ্রসাদ বলেছেন “কুপুত্র

যদিও হয় কুমাতা কখন নয়।” “ওরা চাহিতে জানে না দয়া নয়—
ওরা চাহে ধন জন আরোগ্য বিজয়।” কত সাধক, কত কবি, দিন
রাত আমাদের চাপকাচ্ছেন তবুও আমাদের মোহনিন্দ্রার অবসান হ’ল
না। মাগো ক্ষমা কর।

“তুমি মাতা, পিতা তুমি,

তুমি বন্ধু সখা তুমি।

তুমি বিদ্যা দ্রবিশিষ্ট তুমি।

তুমি সব মম দেব দেব ॥

প্রণাম।

“কর্ম মাত্রই সাধনা জীব মাত্রই সার্থক”

—মা আনন্দময়ী

With best Compliments of :

By Courtesies of :

P. Manickam & Co.

Civil Engineering Contractors

21, PERAMBUR BARRACKS ROAD

PATTALAM

CHENNAI-600 012

Phone : 532-3296/532-5893

নাম কীৰ্ত্তন

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র রক্ষিত

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বলেন, রাম বল, বা কৃষ্ণ বল, বা হরি বল, বা গৌর বল, এঁদের কথাই কথা। আর সব বৃথা ও ব্যথা। পবিত্র কোরাণে আছে, ঈশ্বর সত্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া লোকে বাহাকে আহ্বান করে, তাহা অসত্য (সুদ্রা লোক্‌মান—৩৩১)।

মহামুনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগ করে নাম পান বেদব্যাাস। সৃষ্টি করেন মহাকাব্য মহাভারত। কিন্তু মনে তৃপ্তি নেই। ভক্ত নারদ বলেন, “নির্ম্মল হরির যশঃ করণি কীৰ্ত্তন, সেই হেতু বিচলিত এত তব মন” উপদেশ দেন, “গাও হরি নাম ব্যাস অবহিত চিতে।”—“তবে ব্যাসশিরোমণি রচিলেন ভাগবত অমৃতের খনি”। রসো বৈসং (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৭।২)। ব্রহ্ম রস স্বরূপ। সে রসামৃত আস্বাদনে নামই একমাত্র পথ। সত্যযুগে ধ্যান। ত্রেতাযুগে যাগ যজ্ঞ। দ্বাপরে সেবা। কলিযুগে শুদ্ধ নাম। “হরেনামি, হরেনামি হরেনামৈব কেবলম্। কল্যো নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। শ্রীচৈতন্য ভক্ত নরোত্তম দাস লিখেছেন,

“নামভজ নাম চিন্তা নাম কর সার।

অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।

নামের সহিত আছেন আপনি, শ্রীহরি ॥

অনন্ত কৃষ্ণের নাম। “পৃথিবীতে যে সকল বৃক্ষ আছে যদি তাহা লেখনী হয় ও সাগর তাহার মসী হয়। তথাপি ঈশ্বর নামের মহিমার কথা সমাপ্ত হইবে না।” (কোরাণ-সুদ্রা লোক্‌মান—৩৩৭)।

নাম ও নামী অভিন্ন। শ্রীশ্রী মায়ের কথা, নামীকে পাবার জন্য নামই আগ্রহ করতে হয়। তাঁর নামের সঙ্গ করলেই তাঁকে স্বরূপে

পাওয়া যায়। নাম কীর্তনে তিনি ভক্তের হৃদয়ে আসেন—I shall come in and fellowship with him and he with me (Bible).

মায়ের বাণী. “নাম কীর্তনে স্থান পবিত্র হয়। যে করে সেত পবিত্র হয়ই, যে শব্দে সেও পবিত্র হয়।” নাম অভ্যাস মাহাত্ম্যে যখন হরিদাস হন ঠাকুর হরিদাস। আর রূপের পসরা নিয়ে যে কুলটা সাধকের সাধন পথে বিঘ্ন ঘটতে প্রয়াস পেয়েছিল, “সে কয়লা হৃদয় গলি তৎকর হয় সাধু।” তিন রজনী হরিদাসের দ্বারা অপেক্ষায় থাকে মিলন আশায় আর অনবধান চিন্তে নাম শব্দে বা নাম সঙ্গ করে। তাতেই মুক্তি। নাম রসে মাতাল হয়ে “প্রসিন্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত।” সল্ রূপান্তরে পল্। রত্নাকর হয়। রত্নের আকর। নাম শ্রবণের উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রী কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহৃতিকে। স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য একই কথা বল্লেন শ্রী মৈত্রেয়ীকে।

“নাম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। অশুদ্ধ চিন্তে নাম ভুল হয় বলে ভগ্নোৎসাহ হয়ো না। নামই তোমায় নাম করবার শক্তি দেবেন। নামই তোমার সর্বনাশ ক্ষয় করে দিয়ে তোমায় নবজীবন দান করবেন।” (মা আনন্দময়ী)। নাম চিত্ত স্থির করে। ভগবানকে নামায় অন্তরে। অন্তর হতে নামে অহংকার। আর সব কলুষতা। রাই ধনী বলছেন সখীদের,—সবাই আমায় বলে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী। শব্দে আমার বড় সুখ। কলঙ্কিনী বলবার আগে, তারা প্রথমে উচ্চারণ করে আমার প্রাণ পদ্রুপের নাম। কৃষ্ণ, পরে কলঙ্কিনী। ও নাম যারা স্মরণ করে, তাদের ত আর কোন পাপ থাকে না। কৃষ্ণমুখী রাই কি তাদের প্রতি বিমুখ হতে পারে।

অনুরাগের সুরে নাম বড় মধুর। সেখানে যত প্রীতি তত আনন্দ। “যে যত আত্মহারা হয়ে এক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রণাম করতে পারে, সে তত শক্তি ও আনন্দ লাভ করে।” (মা)। নামের

দাঁখনা পবন যদি দোলা দেয় মন বিতানে, ভক্তি কুসুম আপনি ফুটে ।” না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে না পারে ... (চণ্ডীদাস) ।

For it's not where we worship that counts but how we worship (Bible) । মা বলেন, “গৈরিক বেশ, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য । কোন প্ররোজন নেই, যেমন আছ সেইভাবে থেকে কেবল চেষ্টা কর, সর্বদা নাম করবার । যার জিহবা নাম গানে কুণ্ঠিত, সে বৈরাগ্যের কথা ভাবুক । যে নাম করতে পারে বৈরাগ্য তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটতে থাকে ।” — “মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আকারে, গুরুদত্ত মহামন্ত্র নিশিদিন জপরে” (রামপ্রসাদ) ।

“খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।

দেশ কাল নিয়ম নাই সর্ব-সিদ্ধি হয় ।”

“নয়গুণ গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ গদ রুদ্ধয়া গিরা, পদলকৈর্নিচিঁতং বপুঃ কদাতা নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি” (শিক্ষাষ্টকম্) । ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন । মাগ্ ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য এক গাম্‌লা, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ? ঈশ্বরের জন্য কাঁদতে বাবুদের লজ্জা হয় ।” একবার তাঁর নাম করে কাঁদ । অশ্রু সাগরে ডুব দাও । “কাঁদতে কাঁদতে যখন বাহির ও অন্তর এক হয়ে যাবে । তখন দেখবে, যাকে এতদিন এমন করে খুঁজেছো, তিনি সকলের প্রাণরূপে অতি নিকটেই বিরাজিত রয়েছেন ।” (মা আনন্দময়ী)

যমুনায কুল কুল স্বরে আজও বিরহিনী রাই কাঁদে, “কেমনে সই পাইব তারে” (চণ্ডীদাস) । রাজার দুলালী, রাজার ঘরণী প্রেম দিবানী মীরাবাই । বনু'ময় নামকী যাচক নগর মোহনকে জাউ ময়” — নামের ভিত্তিগণী হয়ে তোমার গান গাহিব রজে তব, হে বজরাজ (অনুরাদ দিলীপ কুমার) । কাঁদে রামপ্রসাদ । কাঁদে বামাক্ষ্যাপা । আর রামকৃষ্ণ । কেঁদে কেঁদে শ্রী গৌরাজে গৌর অঙ্গ কালি হল । কাঁদে আর কাঁদায় । কেবল কান্না আর কান্না । যিনিই কেঁদেছেন

তিনিই পেয়েছেন। যিনিই পেয়েছেন তিনিই কেঁদেছেন। দুঃখে একবার কান্না। আনন্দে একবার কান্না। তোমাকে না পেয়ে কান্না, কবে তোমায় পাব। পেয়ে পেয়ে কান্না, এতদিন তুমি ছিলে কোথায়। না পেয়ে কান্না, দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। পেয়ে কান্না, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি (অচিন্ত্যকুমার)। ভক্ত কবীর বলেন, সব নেশারই হ্রাস ও বৃদ্ধি আছে। কিন্তু নাম নেশা কেবলই বেড়ে যায়। নাম শ্রবণ করলে হিয়াতে লাগে তার স্পর্শ। নামে প্রেম জন্মালে তন্দ্র হয় আবেশাচ্ছন্ন। (ভারতের সাধক)।

একং সদ্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি। (ঋগ্বেদ-১।১৬৪।৪৬)। “আল্লাহ এক। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল” (কোরআন শরীফ)। মা আনন্দময়ী বলেন, সর্ব নাম তাঁর নাম। সর্বরূপ তার রূপ। সর্বগুণ তাঁর গুণ। সর্বভাব তাঁর ভাব।” সবাই সম শক্তি ধরে। জল, পানি,, ওয়াটার। একই বস্তু ভিন্ন নাম। মুসলমানের আল্লাহ। খৃষ্টান বলেন—গড্। এক হিন্দুর মধ্যেই কত রকম।

শিব রূপে ধর শিঙা। কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।

ও মা রাম রূপে ধর ধনু, কালী রূপে অসি। (রামপ্রসাদ) কেহ এক কথায় বলেন, ব্রহ্ম। সর্বৎ খলিবদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৪।১)। বেদান্তে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ—সৎ-চিৎ-আনন্দ। শ্রী অরবিন্দের দিব্যজীবন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—“বচনে মননে তাঁর কুল পাই না। অথচ হৃদয় দিয়েত তাকে পূরাপূরিই পাই। আর সে পাওয়ারে হৃদয় ভরে উঠে উপচে পড়ে।” মায়ের বাণী “যে নাম, যে রূপ ভাল লাগে, সর্বদা করে যাওয়ার চেষ্টা কর। যে নামেই ডাকো, উত্তর আসবে একই স্থান হতে।” “যাঁরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়ে ভক্তি পূর্বক অন্য দেবতার পূজা করেন। তাঁরাও অজ্ঞানবশতঃ আমারই পূজা করেন।” (গীতা—১।২৩)।

মধুর বৃন্দাবনে মদন গোপাল মন্দির । বিগ্রহ সম্মুখে রামভক্ত
তুলসীদাস । গণ্ডদেশে অশ্রুমতির মালা । বল্ছেন—হে নাথ,
অপরূপ তোমার সাজ । কিন্তু তুলসী যখন চরণে মাথা নোয়াবে
তখন তোমায় ধনুর্বাণ হাতে নিতেই হবে । বাঁশীতে আর চল্বে
না । মদন গোপালজী সৈদিন ভক্তের বাসনা পূরন করবার জন্য ধনুক
হস্তে শ্রীরাম রূপে প্রকট হয়েছিলেন । (ভারতের সাধক-ভক্ত তুলসী-
দাস) ।

আমার আছেন পরম মা । “সৌম্য সৌম্যতরশেষ সৌম্যেভ্যঃ
স্তুতি সন্দরী” (শ্রীশ্রী চণ্ডী) । সুন্দর, আরও সুন্দর । অশেষ
সুন্দর হতে ও অতি সুন্দর । রাজ রাজেশ্বরী । পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণী ।
সত্য স্বরূপা । আনন্দ স্বরূপা । মর্ত্য-কায়ী সীমায় পরম যোগিনী
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী । নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমো ।

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,

আমায় আনন্দে ভাসাও । (রবীন্দ্রনাথ)

জোর করে ঔষধ খাওয়া, ইচ্ছা না হলেও ভগবৎ চিন্তার আশ্রয়
নেওয়া মানুষ মাত্রেই কর্তব্য ।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

TRIACE TURNKEY

870 Block 'A' Lake Town

Calcutta—700 089

Phone—534-4157

Engineers Whoensure Quality

Fire Proilction System

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে গুরুপরম্পরা মাধুর্য

অভিজিত ভট্টাচার্য

স্থূলদেহের চেতনার বস্তুবিশ্বে যখন কোন অভাবনীয়, অপূর্ব, এবং অভূতপূর্ব ঘটনার সমাবেশ হয় জৈবচেতনা তখনই উপলব্ধি করতে পারে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনকে। প্রাথমিক অবস্থায় বলা যেতে পারে যে একটি মূল প্রবহমান মহীয়ান অধ্যাত্মস্রোত যখন তাঁর চৈতন্যের ডালপালা মেলে ধরে তাঁর প্রত্যেক স্তরে স্তরে সে রেখে যায় “অধ্যাত্ম দ্যুতি সম্বলিত দেহাধার”। From predecessor to successor এভাবেই সেটি ছিড়িয়ে চলে। সাধারণ হিন্দু সমাজেই আমরা দেখতে পাই কোঁলগ্য বংশপরিচয় প্রভৃতি গৃহীর আদরের বস্তু এবং মর্যাদার পরিচায়ক। ধর্মগোষ্ঠীও সেইরূপ আচার্য বংশকে গৌরবময় ও শ্রদ্ধাশীল সত্ত্বাপূর্ণে পরিগণিত করে। এম্হলে এটি জেনে রাখা উচিত যে প্রখ্যাত আচার্য ঋষিগণ যেমন সংসার বৃক্ষ-বংশের মূলাধাররূপে স্থিত এবং গোত্র নামে প্রখ্যাত, ঠিক সেইরূপ শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরই প্রত্যেক আচার্যবংশের আদি হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ “আচার্যানাং অসাবসৌ ভগবন্তঃ” বলে বস্তুটিকে আরও প্রস্ফুটিত করে তুলতে পারি যে শ্রীভগবান হতে আরম্ভ হয়ে আমাদের আচার্য বংশে অমর অমর বিদ্যমান ছিলেন। ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাঝে মূলতঃ শ্রীবৈষ্ণব (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী) সম্প্রদায় গুরুপরম্পরা স্মরণ-অনুধ্যানকে অসাধারণ মূল্য দিয়েছে। “জগদ্ব্যং গুরুপরম্পরা মন্ত্ৰং চ” বলে সেটি প্রার্থনার এক প্রধানতম অঙ্গ বলে নির্দেশিত হয়েছে। আচার্য শ্রীষতীন্দ্র রামানুজ দাস এর মহত্ব সম্পর্কে তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ “গুরুবর বলরাম”-এ লিখছেন নিয়মিত মহীয়ান পূর্ব্বাচার্যদের নাম, তাঁহাদের ইতিবৃত্ত তাঁহাদের জ্ঞান এবং অনুষ্ঠানের ধারাবাহিক স্মরণে, বিশিষ্ট পরম্পরাগত মহাজ্ঞানী অনুষ্ঠানশীল, বিশিষ্ট আচার্যগণের অনুষ্ঠিত প্রণালীতে

ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ়তা ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞানানুষ্ঠান-প্রণালী পরিপুষ্টরূপে নিজ আচার্য্যের মধ্যে দর্শনে এই ধারার সুস্পষ্ট রূপটি শিষ্যের হৃদয়ে গভীর রেখাঙ্কিত হইয়া যায়। তখন আচার্য্যপদিষ্ট পথে আচার্য্যের অনুগতভাবে উৎসাহভরে অবতীর্ণ হইয়া শিষ্য সাধন ভজনে অগ্রসর হইয়া সাফল্য লাভ করে....।” (“গুরুদ্বর বলরাম” থেকে উদ্ধৃত) এখন আমাদের জৈবচৈতন্য এলে দেখতে পাবো যে এই বিশিষ্ট আচার্য্য পরম্পরায় সম্প্রদায় বিশেষে বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বর্ত্তমান। এহলে সম্প্রদায় (বা সাম্প্রদায়িক) শব্দটি কোন সঙ্কীর্ণতার সংজ্ঞায় বিভূষিত না করাই উচিত। সম্প্রদায়, ব্যুৎপত্তিগতার্থে—“যে গোষ্ঠী বা যে প্রতিষ্ঠান সম্যকরূপে দান করে থাকে”। ভারতের অগণিত ধর্মসাধনমার্গের প্রত্যেকটিরই সর্বিশেষ মূল্য অধ্যাত্মজগতে অশেষ যোগদান এবং অসামান্য উপকারিতা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সর্বমূল বস্তুটি হল রুচি। যা চিত্তের (গভীরতর হলে আত্মাগত সত্ত্বার) মধ্য থেকে উঠে এসে নিজ সূনির্দিষ্ট পন্থার প্রতি অনুরাগ, আনুগত্য ও আচরনমুখী করে তোলে। এটি স্বতঃস্ফূর্ত এবং পদ্বর্ণনির্দিষ্ট, কারো অনুরোধ উপরোধে নির্ধারিত হয়না সেটা অনুভবী ব্যক্তি মাত্রই জানেন। তাই রুচিভেদেই অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয়ে নিজ নিজ অভিমত মার্গেই দ্রুত উন্নতির সম্ভাবনা অধিক। তাই দেখতে পাই যে ধর্মজগতে যেস্থলে ইন্দিয়াতীত বস্তুসত্ত্বার সাথে আমাদের সম্বন্ধ, সেন্থানে অন্তলীন সাধনমার্গপন্থায় সাধনোজ্জ্বল গুরু ভাবদ্ব্যতি ভগবদ্-অনুভূতি ও অধ্যাত্ম সাধনার মেরুদণ্ডরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই প্রবন্ধে তাই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুবিশাল এবং মন্ত্রের ন্যায় অবশ্য পাঠ্য গুরুপরম্পরার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই এই মাধুর্য্যময় গুরু পরম্পরাকে অপূর্ব্ণ ভাবে বিভাবিত করে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীযামুনাতাচার্য্য স্বামী লিখেছেন :—

“ভগদ্বন্দনং স্বাদ্যং গুরুবন্দন পদ্বর্ষকং ।

ক্ষীরং শর্করাযুক্তং স্বদতে হি বিশেষতঃ ॥”

(আলবন্দার স্তোত্র)

অর্থাৎ দুধ স্বভাবতঃ স্বাদযুক্ত হলেও তাতে শর্করা (চিনি) মিলালে মেমন অধিকতর সুস্বাদু রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে, সেইরূপ পদ্বর্ষ শ্রীগুরু এবং গুরুবংশ (গুরুপরম্পরা) বন্দনা করে ভগবদ্-বন্দনা করলে উহা অধিকতর উপাদেয় হয়। আমরা সাধারণ অবস্থাতেও দেখি যে উপনিষৎ পুরানেও শ্রীগুরু প্রাধান্য বহুবার ব্যক্ত হয়েছে। ১০০০

এক একটি ধর্মপন্থার সিদ্ধ গুরুমন্ত্র, মন্ত্রাধীন দেবতা, জ্ঞান এবং অনুষ্ঠানপ্রণালী ধারাবাহিকভাবে কত যুগ ধরে কত অগণিত প্রজন্মন্ত পাবকের ন্যায় সিদ্ধমহাপুরুষদের মধ্য দিয়ে পরবর্তী যোগ্য সিদ্ধ গুরুদের মাঝে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কতখানি সাধনোজ্জ্বলা শক্তি, কত ত্যাগ তিতিক্ষা, ভক্তি ও কৃষ্ণের সম্পদ এর মধ্যে নিহিত রয়ে যায় ও এই পন্থার পন্থীর মনে ও অন্তরাত্মায় আলোড়ন তোলে তা বলাই বাহুল্য। বিশেষভাবে শ্রীসম্প্রদায় (বিশিষ্টদ্বৈতবাদী) অন্তর্গত সাধনমার্গে সম্প্রদায়গত মহাপুরুষগণ সিদ্ধ পূর্বাচার্যপরম্পরা হতে সুরক্ষিত জ্ঞানভান্ডার নিজ নিজ আচার্য্যমুখে প্রাপ্ত হয়ে তদ্ অনুগুণ অনুষ্ঠানের প্রতি ঐশ্বরিক নিষ্ঠা দর্শনে সৌভাগ্যবান হয়ে, নিজের জীবনে গুরু-আচারিত পন্থা ও অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলেন এবং ভগবৎ-প্রসাদে সাধনসীমায় মন্ত্রসিদ্ধি, জ্ঞানসিদ্ধি ও অনুষ্ঠানসিদ্ধি লাভ করে থাকেন। তাঁরপর সেই একই রূপে উত্তরশিষ্য পরম্পরায় এই সঙ্গঠিত গুরুরক্ষবীজটি বিতরিত হয়ে যায় যাঁর মূল হচ্ছে এই আচার্য্য পরম্পরা বা গুরুপরম্পরা বা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি মূল্য অঙ্গ।

*

*

*

কলিযুগে উদ্ভূত চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথাপ্রসঙ্গে পশ্চ.
পদ্যরূপে রয়েছে :—

“অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রীমাধবীরাদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিত পাবনাঃ ।

চত্বারস্তে কলৌ দেবি সম্প্রদায় প্রবর্তকাঃ ॥

অর্থাৎ কলিযুগে চারজন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হবেন । শ্রী, মাধবী, রুদ্র ও সনক । এই চারজন কলিযুগে বৈষ্ণব হয়ে চারটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করে পৃথিবীকে পবিত্র করবেন ।

প্রমানপ্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থেও একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাতে দেখা যায় যে শ্রীলক্ষ্মীদেবী রামানুজকে, চতুমুখ ব্রহ্মা মধবাচার্যকে, মহাদেব রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং শ্রীসনকসনন্দাদি চতুঃসন নিস্বাদিত্যকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলে গ্রহণ করেছিলেন । এদের থেকেই চারটি মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—রামানুজ, মাধব, বিষ্ণুস্বামী অথবা বল্লভ এবং নিস্বাক সম্প্রদায়গণ । অন্যান্য বৈষ্ণব মতগুণি কোন না কোন ভাবে এই চারটির সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে কথিত ।° এখন আমাদের লক্ষণীয় বিষয় হল যে এই চারটি সম্প্রদায়েই সুবিশাল গুরুপরম্পরা বর্তমান কিন্তু শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে । সেটি হল বিশিষ্ট দ্বৈতবাদে পূর্বাচার্যস্মরণ ও পরম্পরাক্রমে সদগুরুগণের অনুধ্যান ও তাঁদের পুণ্য আচরনের মনন একটি বিশিষ্ট প্রাত্যহিক ও নিত্য সাধনক্রিয়া রূপে অঙ্গীভূত রয়েছে । তাই শ্রীসম্প্রদায়ে সর্বকালে একটি সারভূত গুরুপরম্পরা ব্যক্তিমায়েই অনুধ্যান করেন—

“লক্ষ্মীনাথসমারম্ভাং নাথযাযদনমধ্যমাম ।

অস্মদাচার্য পরিস্তাং বন্দে গুরুম্পরাম্ ॥”

এখন শ্রীলক্ষ্মীনাথ হতে আরম্ভ হয়ে নাথমুনি ও যামুনাতাচার্য হয়ে এ পর্যন্ত অনেকেই আচার্য হয়েছেন। তাঁদের গুরুপরম্পরা-ক্রমে সংক্ষিপ্তসারে বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

*

*

*

“শ্রীজী বা লক্ষ্মীদেবী হতে যে সম্প্রদায়ের উদ্ভব তাই শ্রীবৈষ্ণব শ্রীসম্প্রদায়, রামানুজ সম্প্রদায় ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। মহাচার্য রামানুজ নানাপ্রকারে এই সম্প্রদায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন বলে তাঁর নামেও সম্প্রদায়কে বহুক্ষেত্রে অভিহিত করা হয়। শ্রীসম্প্রদায়ের সর্ববিশাল ও সুপ্রাচীন—গুরুপরম্পরাক্রমকে তিনভানে ভাগ করা হয়েছে :—

১। পূর্বাচার্যবর্গ ২। রামানুজ ৩। উত্তরাচার্যবর্গ

১। পূর্বাচার্যগুরু পরম্পরায় অবরোহনে ক্রমান্বয়ে যাঁরা বর্তমান তাঁদের সূত্রপাত এভাবে :—

শ্রীনারায়ণ, শ্রীজী (লক্ষ্মীজী), শ্রীবিশ্বকসেনজী, শ্রীশঠকোপ-আড়বার, শ্রীনাথমুনি, শ্রীপদ্মডরীকাক্ষ স্বামী, শ্রীরামমিশ্র স্বামী, শ্রীযামুনমুনি, শ্রীমহাপদস্বামী।

২। এরপরে ভারতবিশ্বব্যাপ্ত বিশিষ্টাষ্ট্রৈতবাদী শ্রীরামানুজের অভ্যুদয় দাক্ষিণাত্যে এবং শ্রীসম্প্রদায়ের ভিত্তিমূল শাস্ত্রময় দৃঢ়তায় ও অসামান্য সাধনবলে তিনি বিশিষ্টাষ্ট্রৈতবাদী সত্ত্বাকে উপস্থাপিত করেন ও শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচারার্থে বহু অবদান দর্শিয়ে যান।

৩। রামানুজের পর উত্তরাচার্য গুরুপরম্পরার এক সুবৃহৎ ক্রম দেখতে পাওয়া যায়। এই উত্তরাচার্যগণের তিনটি শাখা :—
ক) শ্রীগোবিন্দাচার্য খ) শ্রীদাশরথি স্বামী গ) শ্রীকুরেশ স্বামী
এই তিনজন আচার্যের অধস্তন গুরুপরম্পরা তিনটি শাখায় ছড়িয়ে পড়ে। সেইরূপে পরিলক্ষিত করলে শ্রীগোবিন্দাচার্য শাখার গুরু-পরম্পরা হল :—

শ্রীগোবিন্দাচার্য, শ্রীপরাশরভট্টর স্বামী, শ্রীবেদান্তী স্বামী, শ্রীকলিবৈরীদাস স্বামী, শ্রীকৃষ্ণপাদ স্বামী, শ্রীলোকাচারী স্বামী, শ্রীশৈলেশ স্বামী, শ্রীবরবরমুনি স্বামী, শ্রীবরদাচার্য স্বামী প্রভৃতি। এস্থলে উপরোল্লিখিত আচার্য্যবর্গের মাঝে শ্রীবরবরমুনি স্বামী একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর মূল কারণ হল যে পূর্বাচার্য্যগণ যে ঐকান্তিক কৃচ্ছসাধন, জ্ঞান, শ্রদ্ধাভাস্তি ও অনুষ্ঠানের দ্বারা এই শ্রীসম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি স্থাপনা করেছিলেন, রামানুজ সেই ভিত্তিমূলকে দৃঢ়তর করে সাধনামার্গের এক বিরাট সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীবরবরমুনি তাঁর অসামান্য সাধন-অনুষ্ঠান বলে পূর্বাচার্য্য পরম্পরা কতৃক সিদ্ধান্তে ও সাধনসৌধে পরিণত এই মহীয়ান সম্প্রদায়কে নানাভাবে, নানারূপে স্ফুরিত করে গেছেন। শ্রীবরবরমুনি দ্বারা স্ফুরিত এই বিরাট সাধনাসৌধমাঝে পরবর্তী আচার্য্যেরা এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন, একাগ্র হতে পেরেছেন নিজ নিজ সাধনায়। এই পর্য্যন্ত এলে শ্রীষতীন্দ্র রামানুজ-দাসজীর ভাষায় বলতে হয় :— “শ্রী সম্প্রদায়ের জন্মেছিলেন আড়্‌বারগণ (ভক্তিসিদ্ধ দক্ষিণী মহাপুরুষগণ) ও পূর্বাচার্য্যগণ, ইহার পৃষ্টিতে ছিলেন রামানুজ এবং ইহার রক্ষায় ছিলেন শ্রীবরবর-মুনি। ”

এরপর বিভিন্ন অবস্থায় শ্রীসম্প্রদায় অভির্বিধিত হতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আরেকবার দৃষ্টিপাত করি সেন্থলে এক নব অভ্যুদয়ের সূচনার আভাস পাওয়া যাবে। রামানুজ তাঁর দেহরক্ষা-কালে ৭২টি (বাহান্তরটি) পীঠ স্থাপিত করে যান এবং প্রত্যেক পীঠে একটি পীঠাধীশ নিযুক্ত করে যান। পীঠাধীশগণ প্রত্যেকেই সমর্থ মহাপুরুষ, অসাধারণ পার্শ্ভিত্যপূর্ণ, রহস্যজ্ঞানসিদ্ধ, রস-মাধুর্য্যময় এবং জ্ঞানময় অনুষ্ঠানের মূর্ত্ত বিগ্রহ। রামানুজের শিষ্যমধ্যে পীঠাধীশগণ প্রত্যেকেই গুরুপরম্পরার অঙ্গীভূত—এদের মাঝে মূখ্য হলেন বেদান্তবিশারদ যজ্ঞমূর্ত্তি, কুরুকাধিনাথস্বামী।

অমরদনারস্বামী, দাশরথি এবং গোবিন্দাচার্য্য। হ্রিম্মুখী গুরু-পরম্পরার (উত্তরাচার্য্যগণ) মধ্যে গোবিন্দাচার্য্যের উল্লেখ ও অধস্তন গুরুপরম্পরার বর্ণনা পূর্বে হয়েছে। এরপর উত্তরাচার্য্যগণের হ্রিম্মুখী ধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুপরম্পরায় দাশরথি স্বামীর অধস্তন গুরুপরম্পরা নিম্নে লিখিত হল :—

দাশরথি স্বামী রামানন্দ^১ বারনাধীশ ইয়ারামানন্দ, বেদাদেশিক স্বামী আদি আবির্ভূত হয়ে রামানন্দের ধর্মধ্বজা উত্তোলিত করে রাখতে সক্ষম হলেন।

শ্রীবেদান্তদেশিক স্বামী থেকে শ্রীসম্প্রদায়ের অন্তর্গত “বড়গল্” শাখা উৎপন্ন হয়। অপর শাখা “তিঙ্গল্” (বা তুইঙ্গল্) নামে প্রখ্যাত। এদিকে উত্তরাচার্য্য পরম্পরায় হ্রিম্মুখী ধারার অন্তর্গত যথাক্রমে শ্রীগোবিন্দাচার্য্য এবং শ্রীদাশরথি স্বামীর পর শ্রীকুরেশ স্বামীর অধস্তন গুরুপরম্পরায় আমরা বর্ণিতরূপে পাই যে শ্রীকুরেশ স্বামীর শাখা হতে শ্রীরামানন্দী সম্প্রদায় উদ্ভূত। এ প্রসঙ্গে শ্রীসীতারাম দাস ওংকারনাথ অনূদিত শ্রীরামানন্দস্বামী বিরচিত “শ্রীবৈষ্ণবমতাস্তজভাস্কর” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

*

*

*

শ্রীবরবরমুনিস্বামীর স্থান গুরুপরম্পরা অন্তর্গত আচার্য্যদের মধ্যে বহু উচ্চ। মর্মজ্ঞ আচার্য্যগণ বরবরমুনিকে রামানন্দের দ্বিতীয় বিগ্রহ বলে থাকেন। বরবরমুনির সময়কাল বিশিষ্টাষ্টৈতবাদের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তিনি পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, অধ্যাত্মসম্বাদনে, অধ্যাপনায়, গ্রন্থপ্রণয়নে এবং সমগ্র পরিচালনায় অতীব পারদর্শী ছিলেন। এস্থলে তাঁর সর্বপ্রমুখ কর্ম হল যে, শ্রীরামানন্দ প্রবর্তিত ৭২টি মঠকে বা “সাধনপীঠকে” সংকুচিত করে মাত্র ৮টি স্থানে নির্বাচিত করে ৮টি মঠ বা পীঠ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। শ্রীবরবরমুনি দ্বারা সংক্ষেপিত ৮টি মঠের অধীশ্বর রূপে ৮জন সর্বগুণান্বিত দিগ্গজ মহাপুরুষগণকে সেই

সেই ক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। গুরুপরম্পরায় এরা “অষ্টদিগ্গজ” নামে প্রখ্যাত। এরা হলেন :—

১। বাণাদ্রিযোগী, ২। বরবেঙ্কট, ৩। শ্রীভট্টনাথ,
৪। প্রতিবাদী ৫। রামানুজ ৬। বরদাৰ্ষ ৭। নতার্তিহর
৮। দেবরাজগুরু।

অষ্টদিগ্গজদের মাঝে শ্রীবরদাৰ্ষস্বামী অন্যতম।

গুরুদেব শ্রীবরবরমুনির তিনি অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং বরবরমুনি নিজে প্রশংসা করে তাঁর শিষ্যের গুণাবলীর কীৰ্ত্তন সুচক একটি তামিল ভাষাগত “তনিয়ন” নামক শ্লোক রচনা করেছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা এখন থাক। গুরুপরম্পরায় শ্রীবরদাৰ্ষস্বামী দক্ষিণ ভারতে অন্নস্বামী বলে প্রতিষ্ঠিত। বলা হয়, যে ভগবান শ্রীরঙ্গনাথজী পূজারীগণ কতৃক বরদাৰ্ষস্বামীকে মন্দির-দর্শন নিষ্ঠায় ব্রুটি জন্মানোর আগে নিজে (শ্রীরঙ্গনাথ) ভক্তকে নরদেহে তাঁর ভাই-এর রূপে “অন্নিন্” (দাদা) বলে ডেকে নিষ্ঠাভঙ্গের থেকে বাঁচিয়ে দেন। তাই যেহেতু শ্রীভগবান স্বয়ং বরদাৰ্ষস্বামীকে অন্ন বা দাদা বলে সম্বোধন করেছিলেন তাই গুরু-লগ্ন নির্বাচনে সকলেই তাঁকে “অন্ন” বা অন্নস্বামী নামে অভিহিত করেন। যে পীঠে তাঁকে মঠাধীশ নিযুক্ত করা হয় সেই মঠটি অন্নগদী নামে প্রসিদ্ধ। অন্নস্বামীর এই শাখার আচার্যগণ ও সমস্ত শিষ্যবর্গ অন্নগদীর অন্তর্ভুক্ত।

এখন আর একটি গদী পীঠ সম্পর্কে বলা যাক। মথুরা থেকে প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে গিরিরাজ গোবর্ধন এবং গোবর্ধন গ্রাম অবস্থিত। ব্রজভূমি বৃন্দাবনের ন্যায় এস্থলেও স্থানমাহাত্ম্য অত্যধিক। আনুমানিক ৮ম শতাব্দীতে শ্রীসম্প্রদায়ের পূর্বাচার্য শ্রীনাথমুনি এই গোবর্ধন পর্বতে এসে তীর সাধনা করেন নিকটস্থ একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন সাধন-গুহায়। অদ্যাবধি সেই গুহা যতিপূর নামে প্রসিদ্ধ এবং এস্থলেই তিনি তাঁহার নিত্যারাধনার বিগ্রহ শ্রীনাথজীর

প্রতিষ্ঠা করলেন। এই গোবর্ধন মন্ডলে প্রতিষ্ঠিত “শ্রীনাথজীর” মন্দির অতঃপর গোবর্ধন গদী নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীনাথ-মুণির পর কয়েক শতাব্দী গোবর্ধন গদী সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য না পাওয়া গেলেও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আজ পর্যন্ত এই গদীর মহান গুরু পরম্পরার নিরন্তর ইতিহাস পাওয়া যায়। এই যুগের প্রথম আচার্য্য হলেন—শ্রীশঠকোপস্বামী। তাই শ্রীমঠকোপ-স্বামী (ষোড়শ শতাব্দী) থেকে প্রারম্ভ করে শ্রীরঙ্গদেশিক স্বামী পর্যন্ত গোবর্ধনগদীতে ছ’জন আচার্য্য বিরাজ করেছিলেন। এদের নাম পরম্পরাক্রমে নিম্নে দেওয়া হল।

১। শ্রীশঠকোপস্বামী ২। শ্রীবেঙ্কটচাৰ্য্যস্বামী ৩। শ্রীকৃষ্ণ-চাৰ্য্যস্বামী ৪। শ্রীশেবাচাৰ্য্যস্বামী ৫। শ্রীশ্রীনিবাসাচাৰ্য্য ৬। শ্রীরঙ্গদেশিকস্বামী।

গুরু শ্রীরঙ্গদেশিকের মহাপ্রয়ানের বছর হচ্ছে ১৮৭৪ সাল (ইংরাজী মতে)। এসময়ে শ্রীসম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো।

গুরু পরম্পরা অব্যবহৃত শেষ পর্যায়ে শ্রীরঙ্গদেশিকস্বামীর পর তাঁর প্রধান শিষ্যবর্গের সাথে পর্যায়ক্রমে সেই আচার্য্যবর্গের নাম নিম্নে প্রদান করলাম :—

শ্রীরঙ্গদেশিকস্বামী, শ্রীনিবাসচাৰ্য্য (পুত্র ও শিষ্য)। অন্যান্য প্রধান আচার্য্য শিষ্যবর্গ হল :—

শ্রীবলরামাচাৰ্য্য (বৃন্দাবন, অযোধ্যা), শ্রীসুদর্শনাচাৰ্য্য (বৃন্দাবন)
 শ্রীকমলনয়নাচাৰ্য্য (জুনাগড়), শ্রীরামপ্রসাদাচাৰ্য্য (দেওরা)
 শ্রীরাজেন্দ্রাচাৰ্য্য (ট্রেটপালী), শ্রীবাসুদেবাচাৰ্য্য (বিয়ানী),
 শ্রীমহাবলাচাৰ্য্য (বিয়ানী), শ্রীরামমিশ্রাচাৰ্য্য (কাশী),
 শ্রীভাগবতাচাৰ্য্য (কাশী), শ্রীতুলারামাচাৰ্য্য (কাশী)
 শ্রীগোবিন্দাচাৰ্য্য (জম্মু), এবং শ্রীরামাচাৰ্য্য (বসাঁও)
 এছাড়াও অধস্তন শিষ্যপরম্পরায় সুবৃহৎ এক আচার্য্যবর্গ
 গড়ে ওঠে। সে সমগ্র নামাবলী এস্থানে প্রেরণ করলে প্রবন্ধের

কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি পাবে। আচার্য্যগণের নামের পাঁজি লেখা এস্থলে মূল লক্ষ্য নয়। এস্থলে মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে এতবড় সাধনোন্মুখ গুরুপরম্পরা (যাঁর মূল অংশের কিছুটাই মাত্র দেওয়া সম্ভব হয়েছে।) তাঁর মধ্য দিয়ে সাধনার, জ্ঞানের, মাধুর্য্যের যে অনন্য, অনন্ত দীপ্তিমান শিখা অগুরু সৌরভের ন্যায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বিশিষ্টাষ্টৈতবাস সেই সন্মহান গুরুপরম্পরাকে ধারণ করে হয়ে উঠেছে আরও মহীয়ান, আরও গরীয়ান, তাই সকলে একসাথে আজ উচ্চারণ করি :

“গুরুদেব পরং ব্রহ্ম গুরুদেব পরাগতিঃ ।

গুরুদেব পরাবিদ্যা গুরুদেব পরায়ণম্ ।

গুরুদেব পরঃ কামো গুরুদেব পরং ধনম্

যস্মাৎ সদৃপদেষ্টাহসৌ তস্মাৎ গুরুতরো গুরুঃ ॥

পাদটীকা

১। ‘যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ

তস্যাতে কথিতাহ্যর্থঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(শ্বেঃ উপনিষৎ)

‘দেবতায় গুরোশ্চাপি মন্ত্রস্যাপি প্রকীৰ্ত্তনাৎ

ঐহিকামৃদ্বিহমকী সিদ্ধির্দ্বিজস্যন্তেন সংশয়ঃ ॥

২। রামানুজশ্রী স্বীচক্রে মধবাচার্য্যং চতুর্মুখঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিস্বাদিত্যং চতুঃসনঃ ॥

৪। মহাপুরুষ শ্রীরামানুজকে স্মরণপূর্ব্বক তাঁর তিরোধানের পর রামানুজের পবিত্র নামে বহু আচার্য্যের নামকরন হয়েছে।

৫। এবিষয়ে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত “অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ”একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব সাধনপন্থায়ুক্ত সাধক সম্প্রদায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রে কিছু গবেষকের দ্বারা এটিকে মাধবসম্প্রদায়ভূক্ত করা হলেও পরবর্তীকালে প্রমানিত হয় যে সাধনগত বহু পার্থক্য বর্তমান রয়েছে মাধব ও গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাঝে।

প্রার্থনা

ব্রজগোপাল ঘোষাল

তব করুণাধারায় সিজ্ঞন করে চলেছ মাগো এ দাসেরে

তব্দ পারিনে ডাকিতে একবারও তোমায় মন প্রাণ এক করে ।

ভিক্ষা চেয়েছিলে শূদ্ধ পনের মিনিটের দিবারাহির মাঝে

সেটুকুও দিতে পারিনি তোমায় এমনি ব্যস্ত নানা অজুহাতে ।

মায়াজালে পরে ঘোরপাক খাচ্ছি দিশেহারার মত

কদ্রোমাঝে ভেক্সম কেবলি আত্মগরিমায় রত ।

সংযম, নিষ্ঠা, সাধনা—সেগুলো তো সবই দূর অন্তঃ

মিথ্যা অহংকারে মগ্ন হয়ে আছি মেতে অবিরত ।

কৃপা করে দেখাও যদি মা মৃদুস্তির সহজ পথ

তবে ব্যর্থ হবে না এ জীবন পদরিবে মনোরথ ।

দাসের এই বিনীত প্রার্থনা রহিল শ্রীচরণে,

আড়াল ছেড়ে প্রকট হলো মাগো তুমি নিজগদগে ।

আবেদন

আনন্দবার্তার গ্রাহকদের নিকট আবেদন করা হইতেছে যে, বাহারা গ্রাহক আছেন তাহারা যদি প্রত্যেকে দুইটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, এবং এককালীন কিছু অর্থ পারিকেশন দপ্তরে অনুদান হিসাবে দান করেন তাহা হইলে পারিকেশন দপ্তর বিশেষ উপকৃত হইবে। আনন্দবার্তার ছাপাবার খরচ প্রত্যেক বৎসর বর্দ্ধিত হওয়ায় আমাদের পক্ষে আনন্দবার্তা ছাপাইবার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হইয়া যাইতেছে। বাধ্য হইয়া ১৯৯৮ হইতে আনন্দবার্তার চাঁদার হার ৪০ টাকা হইতে ৬০ টাকা করিতে হইয়াছে। সোসাইটির সদস্যদের নিকট আবেদন করা হইতেছে যে তাহারাও যদি কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তাহা হইলে সোসাইটি ও পারিকেশন দপ্তর উপকৃত হইবে।

আশা করি আবেদনে সকলে আন্তরিকভাবে সাড়া দেবেন।

জয় মা

তপন বোস

সম্পাদক

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি

৫৭/১, বালিগঞ্জ সাকুলার রোড

কলিকাতা-৭০০ ০১৯

দূরভাষ : ৪৭৪-৮৫০৪

২রা, জানুয়ারী, ১৯৯৮

জন্ম মা

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর একশত তিনতম

শুভ আবির্ভাব মহোৎসব

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটি

কলিকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

“মাতৃ মন্দির”

৫৭/১, বালিগঞ্জ সাকুলার রোড, কালিকাতা-৭০০০১৯

দূরভাষ-৪৭৪-৮৫০৪

প্রিয়ভ্রাতা/ভগিনী,

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আগামী ওরা মে '৯৯ সোমবার (বাংলা ১৯শে বৈশাখ ১৪০৬) সকাল ৬টা হইতে সারারাত্রি ব্যাপী মাতৃমন্দিরে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের একশত তিনতম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব উদ্‌যাপিত হইবে ।

এই মহোৎসবে আপনার সক্রিয় যোগদান একান্তভাবে প্রার্থনীয় ।

“জন্ম মা”

বিনীত

উৎসব কর্মিটি

ইং ৩১শে মার্চ ১৯৯৯

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল

বাং ১৭ই চৈত্র ১৪০৫

সোসাইটি

ওরা মে সোমবার ৯-৩০ মিঃ থেকে পূজা আরম্ভ ।

রাত্রি ২-৩০ মিঃ থেকে বিশেষ তিথি পূজা পূর্ণপার্জলি ।

শোক সংবাদ

১। শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত প্রফেসর প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত গত ২৪শে ফাল্গুন ১৪০৫ (১০ই মার্চ, ১৯৯৯ বৃদ্ধবার) ব্রাহ্মমহোৎসবে মায়ের চরণে স্থান লাভ করেন।

আমাদের চিরপরিচিত প্রফুল্লদার জন্ম ১৯২৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরের নিকটবর্তী লক্ষ্মীপুর গ্রামে, ফরিদপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর উদ্ভিদবিদ্যায় শিক্ষালাভ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৫০ সালে এম. এস. সি পাশ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে যোগ দেন। দুই বৎসর পর অধ্যাপনা করতে আসেন চন্দননগর কলেজে। আর তার সাত বৎসর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরই মাঝে এসেছে গবেষণালব্ধ পি. এইচ. ডি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ সময় অধ্যাপনা ও গবেষণা পরিচালনা করে প্রফুল্লদা প্রকাশ করেছেন ২২৫টির উপর গবেষণাপত্র বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রিকায়। তাঁর নির্দেশিত পথে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি পেয়েছেন ২৭ জন ছাত্রছাত্রী। বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করেছেন ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার। ১৯৭৯ সালে প্রফেসর ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান হন।

অল্প বয়স থেকেই প্রফুল্লদা ধর্মভাবাপন্ন। স্কুল জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যুক্ত হন। আই. এস. সি পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিষয়ক চিন্তা ও শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য তাঁকে নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৪৭ সালে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের দর্শন পান। মায়ের দৃষ্টিপাতে তাঁর মধ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন ও আনন্দ সঞ্চারিত হয়। সেই ভাবটি সর্বদা তাঁর মস্তিষ্কে ঘিরে ছিল প্রায় ৬ মাস। সেই থেকে মায়ের সাথে তাঁর সংযোগ। মায়ের বাণী 'একেতেই সব, সবতে এক দেখ' এবং 'জনতাই জনার্দন'—আদর্শরূপে রেখে তিনি তাঁর চন্দননগরস্থ বাস-

ভবনে প্রতিষ্ঠা করেন 'আনন্দভারতী'। প্রতিমাসে সংস্কৃত, মায়ের আলোচনা ও প্রতিবছর সাড়ম্বরে মায়ের জন্মোৎসব করে গেছেন বিরামহীন ভাবে তাঁর বাসভবনে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। 'আনন্দভারতী' পত্রিকা যা পরে নামান্তরিত হয়ে হয় 'আনন্দাভি-ষাত্রী'। বিজ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়াই ছিল পত্রিকার মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রফুল্লদা ছিলেন পত্রিকার মূখ্য সম্পাদক। দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন আনন্দময়ী সংঘের সক্রিয় সভ্য, আনন্দবার্তার অন্যতম উপদেষ্টা ও প্রকাশক। তাঁর নিরলস কলম ভক্ত সমাজকে উপহার দিয়েছে অসংখ্য ধর্মমূলক তাত্ত্বিক রচনা ও মায়ের লীলা প্রসঙ্গ। তাঁর বিনয়ী, অনাড়ম্বর ব্যক্তিত্ব আকর্ষণ করেছে সমাজের সকলশ্রেণীর মানুষকে।

একদিকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা, অপর দিকে শাস্ত্রা-লোচনা ও অধ্যাত্ম সাধনা—এই অপূর্ব সমন্বয়ে গড়ে ওঠা প্রফুল্লদার শুদ্ধসত্তার প্রস্থান ভক্ত সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি।

২। শ্রীশ্রী মার চরণাশ্রিতা অন্যান্য কন্যা শান্তি ঘোষ গত ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৯ বৃহস্পতিবার মাতৃচরণ কমলে লীন হয়েছেন। শান্তিদির স্বামী স্বর্গীয় মাখন ঘোষও শ্রীশ্রীমায়ের অত্যন্ত কৃপাধন্য ভক্ত ছিলেন। এই ভক্ত দম্পতি শ্রীশ্রীমায়ের নানা আশ্রমের বিভিন্ন কাজে এবং সাধু সন্তদের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। ৭ই জুলাই ১৯৮১তে মাখনদা শ্রীশ্রী মার কোলে আশ্রয় পান। কিন্তু তার পরেও শান্তিদির অনেক প্রকার অসুস্থতা ও অসুবিধার মধ্যেও তার নিজের নিউ আলিপদর, কলিকাতায় অবস্থিত বাসভবনে মাতৃমন্দিরের তেতলার এক অংশ মায়ের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়েছিল সেবা স্বহস্তে করে গিয়েছেন।

৩. শ্রীশ্রীমার শ্রুভাগমন শান্তিদির ও মাখনদার বাসগৃহে ১৯৬৯ সাল থেকে আরম্ভ করে নয় বার হয়েছিল। আজও সেই অংশ

শ্রীশ্রী মার মন্দির রূপেই সংরক্ষিত আছে। কত সাধু মহাত্মার ও ভক্তবৃন্দের সমাগমে মাতৃমন্দির উৎসব গৃহের মতো আনন্দোজ্বল ও ভজন কীর্তনে মদুর্খরিত হয়ে উঠতো। কত ভক্তের দীক্ষাও হয়েছে এই মন্দিরে। শান্তিদি মাতৃভক্তদের অনেক স্নেহ ও ভালবাসা পেয়েছেন। শ্রীশ্রীমার সময়ে ব্যবহার করা নানা মসলাপাতি, যা শান্তিদি নিজের হাতেই তৈরী করেছিলেন, দেখা গেছে তা ১৪ বৎসর পরেও নষ্ট হয়নি। ১৯৯৩ সালে যখন সৎসঙ্গ ও ভাণ্ডারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন মায়ের ভোগ রান্না করার জন্য সেই মশলাপাতিই ব্যবহার করা হয়েছিল। এ যেন মায়েরই এক অশুভুত লীলা। তাঁদের বাসগৃহ আজও একটি পবিত্র মন্দির বলেই আমরা মনে করি।

শান্তিদি প্রথম ১৯৫২ সনে শ্রীশ্রীমার কৃপাধন্যা হন এবং মায়ের আশীর্বাদ পান। তারপর ১৯৬১ সালে শ্রীশান্তিদি ও শ্রীমাখনদা একসঙ্গে আগড়পাড়া আশ্রমে দীক্ষা নেন।

শ্রীশান্তিদির মতো স্নেহময়ী, নিরাভিমানী স্নেহপরায়ণা, তদগত প্রাণা নিষ্ঠাবতী মহিলা দুর্লভ। প্রারম্ভের ফলে তিনি শারীরিক ও মানসিক অনেক যন্ত্রণা পেয়েছেন। কিন্তু ভাইজীর দ্বাদশবাণী অন্তিমবাণী তিনি নিজের জীবনে চরিতার্থ করে দেখিয়েছেন। পরম শ্রদ্ধেয় ভাইজী বলেছেন “প্রারম্ভ কাটাবার জন্য উৎকর্ষ তপস্যা আবশ্যিক। শোক সন্তাপ আজি আমাদের প্রারম্ভের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই কথা মনে রেখে সব সময় স্নেহে দৃঢ়তায় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে সম্পদে ও বিপদে তার অজস্র কৃপাধারা আমাদের উপরে অজস্র ধারায় বর্ষিত হচ্ছে।

প্রারম্ভের সকল ভোগ শ্রীশান্তিদি এই জীবনেই কাটিয়ে গেলেন বলে মনে করি।

শ্রীশ্রীমা তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্ধারগতি করুন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারে ধৈর্য্য দিন এই প্রার্থনা।

অন্তিম সংবাদ

গত ১৭ই পৌষ ১৪০৫ (ইং ২রা জানুয়ারী ১৯৯৯) শনিবার সকাল ১০টা ৩৮মিঃ শ্রীমতী মনিমালা দেবী সজ্জানে সাধনোচিত ধামে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন ।

তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধর্গতি ও আত্মীয় স্বজনের সান্ধনা কামনা করি ।

* * *

গত ২০শে পৌষ ১৪০৫ (ইং ৫ই জানুয়ারী ১৯৯৯) মঙ্গলবার শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের অতি পুরাতন ভক্ত ডাঃ অনিল মৈত্র সজ্জানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন । তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধর্গতি ও আত্মীয় স্বজনের সান্ধনা কামনা করি ।

* * *

গত ৪ঠা মাঘ ১৪০৫ (ইং ১৮ই জানুয়ারী ১৯৯৯) সোমবার শ্রীমতী সোমা চ্যাটার্জী সজ্জানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন । তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধর্গতি ও আত্মীয় স্বজনের সান্ধনা কামনা করি ।

* * *

গত ৬ই মাঘ ১৪০৫ (ইং ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৯) বৃধবার পবিত্র বোসের পুত্র প্রবীর বোস সজ্জানে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাতার শ্রীচরণে বিলীন হইয়াছেন । তাঁর বিদেহী আত্মার উদ্ধর্গতি ও আত্মীয় স্বজনের সান্ধনা কামনা করি ।

সংবাদ

অন্তিম সংবাদ

বিগত ৩০শে মার্চ ১৯৯৯ মঙ্গলবার দুপুর ২টা ১০ মিনিটে বিখ্যাত দানবীর শ্রীযুক্ত মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বড় দৌহিত্রী এবং প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিক ডঃ শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্যের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমায়ের আদরের গীতা ভট্টাচার্য মায়ের শ্রীচরণে চির শান্তি লাভ করেন।

গুরুদ্ব্যপ্রিয়াদির তিনিই প্রথম শিষ্যা যার মাধ্যমে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের অত্যন্ত নিকটতম হয়েছিলেন ও মায়ের অকুপণ স্নেহ ও কৃপালব্ধ হন যা তিনি তাঁর “শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের পদপ্রান্তে” বইয়ে বলে গেছেন।

তাঁর এই অকস্মাৎ প্রয়াণে আমরা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁর আত্মার উদ্ধৃতি ও আত্মীয় স্বজনের স্বাস্থ্যনা কামনা করি।

1. AGARPARA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P. O. Kamarhati, Cal.-700058, Tel : 5531208.
STD : 033
2. AGARTALA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Palace Compound, P. O. Agartala-799001
(West Tripura)
3. ALMORA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Patal Devi, P.O. Almora-263602 (U.P.)
Tel : 23313, STD : 05962
4. ALMORA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Dhaul-China, Almora, Pin-263881 (U.P.)
5. BANGALORE Shree Shree Ma Anandamayee Bhagavath Bhavan, 16th
Main, J. P. Nagar, II Phase, Bangalore-560078
(Karnataka)
6. BHOPAL Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Bairagarh, Bhopal, Pin-462030 (M.P.)
7. BHIMPURA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Ph 33208
P.O. Chandod, Distt. Baroda, Pin : 391105 STD 02663
8. CALCUTTA Shree Shree Ma Anandamayee Charitable Society 57/1,
Ballygunge Circular Road, Cal.-700019
Ph. 474-8504
9. DHAKA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
14, Siddheswari Lane, Dhaka-17 (Bangladesh).
Ph. 403-765
- 10. DEHRADUN Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kishenpur, P.O. Rajpur, Dehradun-248009.
(U.P.) Ph. 684471 STD : 0135
11. DEHRADUN Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
176, Rajpur Road, P.O. Rajpur, Dehradun,
Pin-248009 (U.P.) Ph. : 684471, STD :0135
12. DEHRADUN Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajpur Ordnance Factory, Dehradun, (U.P.)
13. DEHRADUN Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
47/A, Jakhan, P.O. Rajpur, Dehradun (U.P.)
14. JAMSHEDPUR Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Bhatia Park, Kadma, Jamshedpur-831005
(Bihar).
15. KANKHAL Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Kankhal, Hardwar-249408 (U.P.)
Tel : 416575 STD : 0133
16. KANKHAL Shree Shree Ma Anandamayee Vidyapeeth,
P.O. Kankhal, Dist. Hardwar-249408 (U.P.)
17. KEDARNATH Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Near Himlok, P.O. Kedarnath, Dist. Chamoli
(U.P.) Pin-246445

18. KHEORA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Vill. & P. O. Kheora (Via Kasba)
Dist : Brahmanberia (Bangladesh)
19. NAIMISHARANYA Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Puran Mandir, P.O. Naimisharanya,
Dist : Sitapur. Pin-261402 (U.P.)
20. NEW DELHI Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kalkaji, New Delhi-110019 (Tel : 684-9365) STD-011
21. PUNE Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Ganesh Khind Road, Pune-411007
(Maharashtra) Tel. : 027835 STD 0212
22. PURI Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Swargadwar, Puri-752001 (Orissa)
23. RAJGIR Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Rajgir, Dist. Nalanda-803116 (Bihar)
Ph. 5362, STD : 06179
24. RANCHI Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Main Road, P.O. Ranchi-834001 (Bihar)
25. TARAPEETH Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Chandipur-Tarapeeth, Dist : Birbhum
(W.B.) Pin-731233
26. UTTARKASHI Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Kali Mandir, P.O. Uttarkashi-249193 (U.P.)
27. VARANASI Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Bhadaini, Varanasi-221001, (U.P.)
Tel. 31-0054, STD : 0542
28. VARANASI Shree Shree Ma Anandamayee Charitable Society,
Regd. H.O. Shivala, Varanasi-221001
Tel : 310592
29. VARANASI Mata Anandamayee Hospital,
Shivala, Varanasi-221001 (U.P.)
Tel : 54230 & 54186
30. VARANASI Ma Anandamayee Karuna,
Shivala, Varanasi-221001 (U.P.)
31. VARANASI Shree Shree Ma Anandamayee Kanyapeeth,
Bhadaini, Varanasi-221001 (U.P.) Ph. : 311794
32. VINDHYACHAL Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
Astabhuj Hill, P.O. Vindhyachal-231307
Dist : Mirzapur (U.P.)
33. VRINDABAN Shree Shree Ma Anandamayee Ashram,
P.O. Vrindaban, Dist : Mathura. Pin-281121
(U.P.) Ph. : 42-4024, STD : 0565